মাসুদ রানা

স্পর্ধা

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

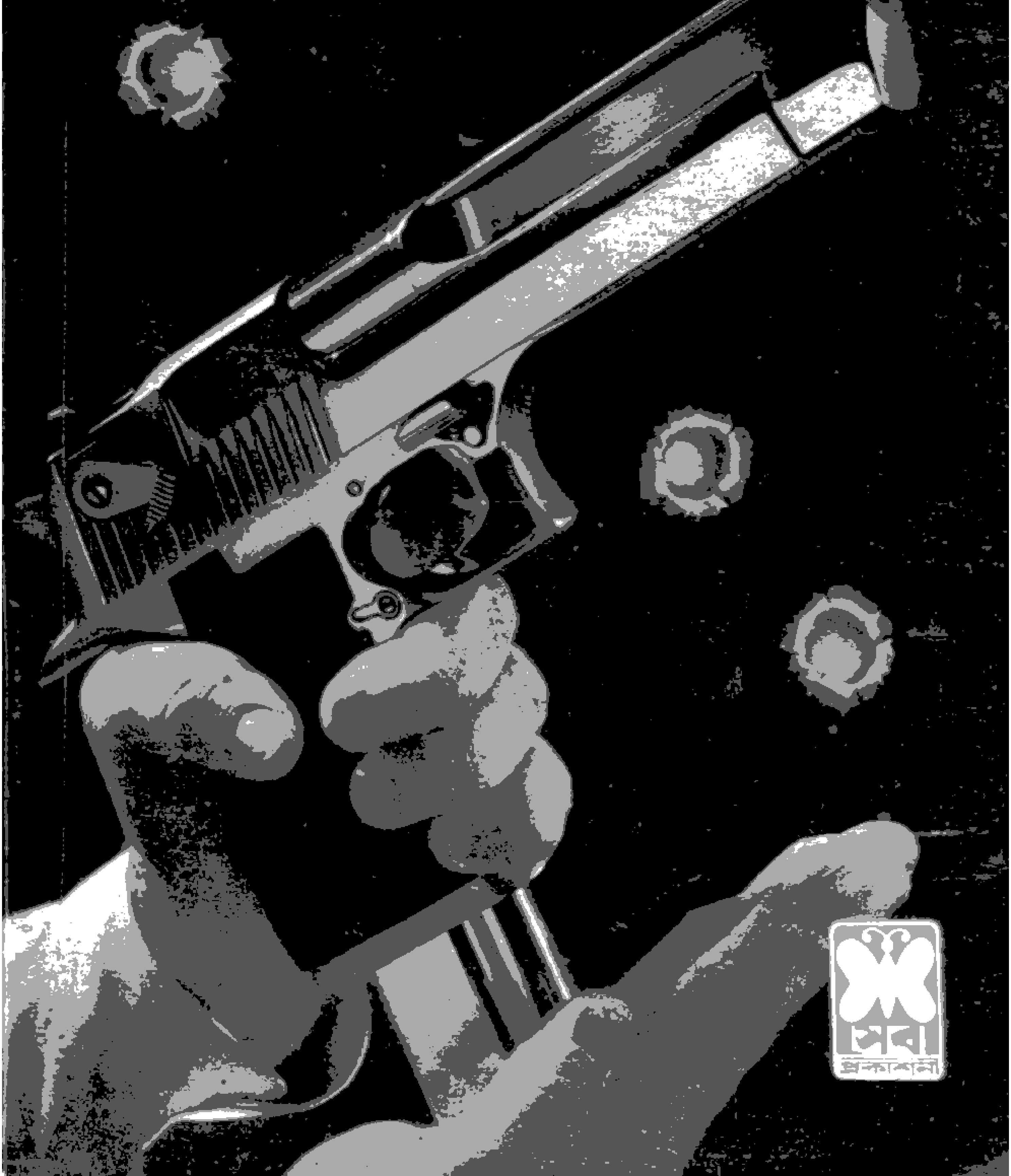

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

স্পর্ধা

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7129-8

স্পর্ধা-১

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

এক

পুলিস নয়, পুলিসের ইউনিফর্ম পরে আছে। প্রকাণ্ড শরীর, তার সাথে মানানসই বড় একটা মাথা। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, কোঁকড়া। বয়স পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ। জুলফির কাছে কয়েকটা পাকা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে আভিজাত্য। গোটা অবয়ব থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে প্রতিভার ছটা। একনজর তাকালেই মনে হয়, যুগস্রষ্টা কালজয়ী পুরুষ হওয়ার জন্যেই যেন তার জন্ম। পুলিস ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় একেবারেই তাকে মানায় না।

তার যা প্ল্যান, সেটাকে দুঃসাহসিক বললেও কম বলা হয়। চিন্তাটা সম্ভবত বদ্ধ কোন উন্মাদের মাথাতেই শুধু আসতে পারে, কিংবা আসতে পারে দুর্লভ কোন প্রতিভার মাথায়। এই অপারেশন সফল করে তুলতে হলে থাকতে হবে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা—তা তার আছে। এমন ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়—পায়নি। দরকার অকুতোভয়, বিশ্বস্ত, নিবেদিতপ্রাণ কিছু কর্মী—যোগাড় হয়েছে। ছোট বড় খুঁটিনাটি হাজারটা কাজ, এর কোনটাতেই এতটুকু খুঁত থাকা চলবে না, তাই বার বার রিহার্সেল দিয়ে যান্ত্রিক নৈপুণ্য আদায় করা দরকার—কর্মীদের সেভাবেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। সম্ভাব্য সমস্ত বাধা বিঘ্নের কথা মনে রেখে তৈরি করা হয়েছে এই প্ল্যান, কোথাও কোন গোলযোগ দেখা দিলে কি করতে হবে তাও সবাইকে জানিয়ে রাখা হয়েছে।

জায়গাটা ড্যালি সিটি আর সান ফ্রান্সিসকোর মাঝখানে, লেক মারসেড। বাতিল একটা গ্যারেজের ভেতর রয়েছে ওরা। কবীর চৌধুরীকে নিয়ে মোট বারোজন। ওদের মধ্যে আরও তিনজনের পরনে রয়েছে পুলিসের ইউনিফর্ম।

গ্যারেজ মানে মুখ খোলা একটা শেড। ছাল ওঠা কংক্রিটের মেঝেতে ইঁদুরের বড় বড় গর্ত। দেয়াল আর সিলিঙে মাকড়সার জাল। শেডের ভেতর একটা মাত্র গাড়ি, পরিবেশের সাথে একেবারেই বেমানান। বাসের মত দেখতে, কিন্তু বাস নয়। চকচকে একটা যান্ত্রিক দানব, কাঁধ সমান উঁচু থেকে পুরোটাই নীলচে কাঁচ দিয়ে ঢাকা। বাসে যেমন সীট থাকে, এতে তা নেই, আছে ত্রিশটা সুইভেল চেয়ার। চেয়ারগুলো পাশাপাশি বা সার করে ফেলা হয়নি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে, সৌখিন কোটিপতির বৈঠকখানায় যেভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রতিটি চেয়ারের সাথে একটা করে ডাইনিং টেবিল, বিলাস বহুল বিমানে যেমন থাকে, টানলেই বেরিয়ে আসবে। পিছনের দিকে রয়েছে একটা ক্লোকরুম আর বার। এগুলোর পিছনে অবজারভেশন ডেক।

অবজারভেশন ডেকের মেঝে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, নিচে দেখা যাচ্ছে গভীর খাদ আকৃতির ব্যাগেজ ডিপার্টমেন্ট। জায়গাটা লম্বা-চওড়ায় সমান, সাড়ে সাত ফিট। ব্যাগ-ব্যাগেজের বদলে ভেতরে অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে রয়েছে একজোড়া জেনারেটর, কয়েকজোড়া সার্চলাইট, তার মধ্যে দুটো বিশ ইঞ্চি: একজোড়া অদ্ভুত দর্শন অস্ত্র, তেপায়া সহ, দেখতে অনেকটা মিসাইলের মত; মেশিন-পিস্তল; দুটো বড় আর চারটে ছোট কাঠের বাক্স; একপ্রস্থ রশি। কবীর চৌধুরীর লোকজন এখনও মালপত্তর ভরছে।

এই কোচ কিনতে কবীর চৌধুরীর পকেট থেকে বেরিয়ে গেছে নব্বুই হাজার ডলার। যে কাজে এটাকে ব্যবহার করা হবে তার তুলনায় এই বিনিয়োগ নিতান্তই তুচ্ছ বলে মনে করছে সে। ডেট্রয়েটের একটা কোম্পানী এই কোচের নির্মাতা, সব মিলিয়ে মাত্র ছ'টা কোচ বানিয়েছে তারা কোচটা রস পেরেট-কে দিয়ে কিনিয়েছে কবীর চৌধুরী। পেরট কোম্পানীকে জানায়, তার মালিক একজন প্রচারবিমুখ মিলিওনিয়ার, কোচটাকে তিনি হলুদ রঙ করা অবস্থায় ডেলিভারি নিতে ইচ্ছে করেন। ডেলিভারি নেয়ার সময় ওটার রঙ হলুদই ছিল, কিন্তু এখন ওটা দুধ-সাদা।

বাকি পাঁচটা কোচের মধ্যে দুটো কিনেছে দু'জন মিলিওনিয়ার, তারা অবসর বিনোদনের জন্যে ব্যবহার করবে ওগুলো। এই দুটো কোচের পিছনে খানিকটা করে জায়গা আছে, একটা করে মিনি কার রাখার জন্যে। আশা করা যায় কোচ দুটোর জন্যে বিশেষভাবে দুটো গ্যারেজ তৈরি করা হয়েছে, এবং বছরের পঞ্চাশ হপ্তাই ওগুলো বিশ্রাম নেবে সেখানে।

বাকি তিনটে কোচ কিনেছে সরকার।

ভোরের আলো ফুটতে আরও একটু দেরি আছে তখনও।

সান ফ্রান্সিসকোর সরকারী গ্যারেজে রয়েছে কোচ তিনটে। সবগুলোই সাদা। দেয়ালে পিঠ ঠেকানো একটা ক্যানভাস চেয়ারে বসে নাক ডাকছে গার্ড। তার কোলের ওপর পড়ে রয়েছে রায়টগান, হাত দুটো চেয়ারের দু'পাশে ঝুলছে। পিছনের ছোট দরজা দিয়ে ওরা দু'জন যখন ঢুকল, গার্ড তখন ঝিমাচ্ছিল। গ্যাস গানের ট্রিগার টানলে কোন আওয়াজ হয় না, হলেও ঝিমুনি ভাবটা কাটিয়ে জেগে উঠতে পারত না গার্ড, কারণ গ্যাসটুকু ফুসফুস স্পর্শ করা মাত্র গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে সে। ঝিমুনির মধ্যে কি ঘটে গেছে, কিছুই তার জানা নেই। এক ঘণ্টা পর যখন তার ঘুম ভাঙবে, ঘুমটা এত গভীর আর দীর্ঘ হলো কেন ভেবে একটু হয়তো অবাক হবে সে, কিন্তু যা ঘটে গেছে তার কিছুই টের পাবে না। ঘুমিয়ে পড়েছিল, এই অপরাধটা সে তার বসের কাছে স্বীকার করবে বলে মনে হয় না।

তিনটেই কবীর চৌধুরীর কোচের মত দেখতে। তবে মাঝখানেরটা তার সঙ্গীদের চেয়ে দু'টন বেশি ভারী। এর কারণ, সাধারণ প্লেট গ্লাসের বদলে এতে রয়েছে বুলেট প্রুফ কাঁচ। এই কোচের ভেতরের অঙ্গসজ্জা এমনই মনোলোভা আর বিলাসবহুল যে একজন ভোগসুখপরায়ণ ভাগ্যবান পুরুষই শুধু এটাকে ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারে। কোচটাকে এভাবে তৈরি করার কারণ আর কিছুই নয়, খোদ মহামান্য প্রেসিডেন্ট এটাকে তাঁর ব্যক্তিগত বাহন হিসেবে ব্যবহার করবেন।

তাই এর নামকরণ করা হয়েছে, প্রেসিডেনশিয়াল কোচ। দুই সেট সোফা, পরস্পরের দিকে মুখ করে ফেলা হয়েছে। মোটাসোটা একজন মানুষ, ঘটে যার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে, এই সোফায় বসার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে। সোফাগুলো এতই নরম, এতই গভীর আর আরামদায়ক যে ভারী একজন লোক বসার পর উঠতে চাইলে হয় প্রচণ্ড ইচ্ছে-শক্তির নয়তো আর কারও সাহায্য নিতে হবে তাকে। চারটে আর্মচেয়ারের ব্যাপারেও এই কথা খাটে। বসার আয়োজন বলতে এই। দরকার হলেই বরফ-পানি পাওয়া যাবে, কিন্তু কৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার উৎসমুখ। চার দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কফি টেবিল। অনেকগুলো সোনালি ফুলদানি, দৈনিক বরাদ্দের তাজা ফুল এখনও পৌঁছায়নি এসে। এই অংশের সামনের দিকে রয়েছে ওয়াশরুম আর বার। সাধারণত বারের রেফ্রিজারেটরে দুনিয়ার সেরা মদ থাকে, কিন্তু বিশেষ কারণে আজ তা নেই। মদের বদলে ওতে রয়েছে ফ্রুট জুস আর সফট ড্রিঙ্ক। বিশেষ কারণটা হলো, এবার যাঁরা প্রেসিডেন্টের মেহমান হয়ে এসেছেন তাঁদের মদ স্পর্শ করা মানা, সবাই আরব এবং মুসলমান।

ওয়াশরুম আর বারের পর কমিউনিকেশন সেন্টার, কোচের পুরোটা প্রস্থ জুড়ে যার বিস্তৃতি। প্রথম দর্শনে মনে হতে পারে মিনিয়েচার ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মেলা বসেছে, প্রেসিডেন্ট কোচে থাকলে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দেয়ার জন্যে লোক থাকে এখানে। বলা হয়, কোচের যা দাম তারচেয়ে অনেক বেশি খরচ পড়েছে এই কম্পার্টমেন্ট গড়ে তুলতে। যে রেডিও টেলিফোন সিস্টেমটা রয়েছে তার সাহায্যে দুনিয়ার যে-কোন শহরের সাথে যোগাযোগ করা যায়। কাঁচের আবরণে মোড়া একসেট রঙিন বোতাম আছে, বিশেষ চাবি ছাড়া ওই আবরণ সরানো সম্ভব নয়। মোট পাঁচটা বোতাম। প্রথমটা টিপলে সাথে সাথে যোগাযোগ ঘটবে ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের সাথে। দ্বিতীয়টা পেন্টাগনের জন্যে। তিন নম্বর বোতাম এয়ারবোর্ন স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ডের জন্যে। চার নম্বর, মস্কোর সাথে যোগাযোগ। পাঁচ নম্বর, লন্ডনের সাথে। এই কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা ফোন লাইন চলে গেছে প্রেসিডেন্টের জন্যে নির্দিষ্ট সীটের পাশে।

কিন্তু আগন্তুকরা প্রেসিডেনশিয়াল কোচ সম্পর্কে আগ্রহী নয়। তারা সামনের দরজা দিয়ে বাঁ দিকের কোচে ঢুকল, সাথে সাথে ড্রাইভারের সীটের পাশ থেকে সরিয়ে ফেলল একটা মেটাল প্লেট। নিচের দিকে টর্চের আলো ফেলল একজন লোক, চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেখে বোঝা গেল যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে সঙ্গীর কাছ থেকে একটা জিনিস নিল সে। পুটিন ভরা পলিথিন ব্যাগের মত দেখতে জিনিসটা, তার সাথে জোড়া লাগানো রয়েছে একটা মেটাল সিলিন্ডার—লম্বায় তিন ইঞ্চির বেশি হবে না, ডায়ামিটারে একইঞ্চি। সিলিন্ডারটা অ্যাঢেসিভ টেপ দিয়ে একটা ধাতব অবলম্বনের সাথে আটকাল সে। কাজ করার সহজ সাবলীল ভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, যা করছে সে-সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা আছে। লোকটা একহারা চেহারার, শরীরে মেদ বলতে কিছু নেই, নাম চেস্টন—একজন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট।

পিছনের দিকে চলে এসে বারে ঢুকল ওরা। বারের পিছনে, একটা টুলের ওপর

দাঁড়াল চেসটন, ওভারহেড কাবার্ডের দরজা হাত দিয়ে সরিয়ে ভেতরে তাকাল। প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রায় এবার যারা তাঁর সঙ্গী হবে, তাদের আর যাই অসুবিধে হোক, তেষ্টায় কোনরকম কষ্ট পেতে হবে না। মদের বোতলগুলো দু'ভাগে ভাগ করে খাড়া অবস্থায় রাখা হয়েছে। বাঁ দিকে দশটা বোতল, প্রতি সারিতে পাঁচটা করে, বুরবন আর স্কচ। কাবার্ড থেকে চোখ নামিয়ে নিচে তাকাল চেসটন, তারপর ঝুঁকে পড়ে কাবার্ডের বাইরে যে বোতলগুলো রয়েছে সেগুলো পরীক্ষা করল। ভেতর আর বাইরের বোতলগুলোর মধ্যে কোন অমিল নেই, বাইরেরগুলোও সম্পূর্ণ ভরা। তার মানে বোঝা যায়, বাইরেরগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাবার্ডের ভেতর কেউ হাত লাগাবে না।

কাবার্ডের গোল ঘরগুলো থেকে দশটা বোতল তুলে সঙ্গীর হাতে দিল চেসটন। সঙ্গী পাঁচটা বোতল রাখল কাউন্টারে, বাকি পাঁচটা ভরল তার ক্যানভাস ব্যাগে। এরপর চেসটনকে অদ্ভুতদর্শন একটা ইকুইপমেন্ট দিল সে। জিনিসটার তিনটে অংশ। ছোট একটা সিলিন্ডার, কোচের সামনে যেটা ফিট করা হয়েছে এটা সেই রকমই দেখতে। একটা মৌচাক আকৃতির ডিভাইস, লম্বায় এবং ডায়ামিটারে সমান, দু'ইঞ্চি। আরেকটা ডিভাইস, দেখতে গাড়ির ফায়ার এক্সটিংগুইশারের মত, তবে এটার একটা প্লাস্টিক হেড রয়েছে। ওটা আর মৌচাক তার দিয়ে সিলিন্ডারের সাথে জোড়া লাগানো।

মৌচাকের গোড়ায় রাবারের একটা শোষ-নল রয়েছে, কিন্তু জিনিসটার ওপর তেমন আস্থা নেই চেসটনের। দ্রুত কাজ করে এই রকম একটা সিরিশের টিউব পকেট থেকে বের করে মৌচাকের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে আঠা লাগাল সে, আঠা লাগানো দিকটা কাবার্ডের গায়ের সাথে চেপে ধরল। এরপর বড় আর ছোট সিলিন্ডারের সাথে জিনিসটাকে জুড়ে দিল, সবশেষে তিনটে জিনিসই ভেতর দিকের গোল ঘরের সাথে, যে ঘরগুলোয় বোতল রাখা হয়, টেপ দিয়ে আটকাল। পাঁচটা বোতল নিয়ে সামনের গোল ঘরগুলোয় আবার রাখল সে। ডিভাইসটা সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেল, কাবার্ড খুললেও সহজে কেউ দেখতে পাবে না।

কাবার্ডের দরজা বন্ধ করে টুল থেকে নামল চেসটন। টুলটা আগের জায়গায় রেখে বাস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। গার্ড তখনও শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, তার নাক ডাকার ছন্দে কোন পতন ঘটছে না। গ্যারেজ থেকে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। পকেট থেকে একটা ওয়াকি-টকি বের করল চেসটন। জিজ্ঞেস করল, 'এস-ওয়ান?'

ড্যালি সিটির উত্তরে বাতিল গ্যারেজের ভেতর তার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর স্পীকার থেকে বেরিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। 'ইয়েস?'

'ও. কে.।'

'গুড।' কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ শান্ত, আনন্দ বা উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই তাতে, তা থাকার কোন কারণও নেই। একটানা ছয় হপ্তা প্রস্তুতি নেয়ার পর আজ কাজ করার সময় কোন ত্রুটি দেখা দিলেই বরং আশ্চর্য হত সে। 'তুমি আর জ্যাক অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাও। অপেক্ষা করো।'

*

টম ওয়াল্টার আর জন মারকুয়েজ, দু'জনের অনেক কিছুই অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। সুদর্শন, আকার-আকৃতি প্রায় একই, ওয়াল্টারের বয়স যদি পঁচিশ হয় মারকুয়েজের বয়স চব্বিশ কিংবা ছাব্বিশ হবে, দু'জনেরই মাথায় রয়েছে সোনালি চুল।

এই হোটেল কামরায় যে দু'জন শুয়ে ছিল, এইমাত্র যাদের ঘুম ভেঙেছে, তাদের সাথেও ওয়াল্টার আর মারকুয়েজের অদ্ভুত সব মিল রয়েছে। বিশেষ করে গায়ের রঙ আর শারীরিক গঠন, চারজনের প্রায় একই রকম। চেহারায় ক্রোধ আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা, চোখে এখন আর ঘুমের লেশমাত্র নেই, কিন্তু লাল হয়ে আছে। ওদের একজন তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল, 'তোমরা কারা? কি চাও? জানো, আমরা কারা?' চট করে আরেকবার ওয়াল্টারের হাতটা দেখে নিল। 'ভেবেছ, তোমার হাতের খেলনা দেখে আমরা ভয় পাব? বেরোও, বেরিয়ে যাও…'

'আরে এসব কি!' অবাক হবার ভান করল ওয়াল্টার, কিন্তু তার কথা বলার ভঙ্গিটা হাস্য-রসাত্মক। 'ভদ্রলোকেরা এভাবে চিৎকার করে নাকি! বেরিয়ে যাও…একজন ন্যাভাল অফিসার হয়ে এরকম ভাষা ব্যবহার করছ, ছি!' নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে বেরেটা পিস্তলটা দেখল সে, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল সাইলেন্সার, তারপর মুখ তুলে আবার বলল, 'তুমিও জানো, এটা খেলনা নয়।'

মুখে যাই বলুক, খেলনা যে নয় লোকটা তা জানে। ওয়াল্টার আর মারকুয়েজের আচরণে শান্ত ঠাণ্ডা একটা পেশাদারী ভাব আছে, সেটাই ওদের দু'জনকে ভয় পাইয়ে দিল। বিছানায় শোয়া অবস্থা থেকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে কি ঘটবে আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হলো না, তাই চুপচাপ শুয়েই থাকল ওরা।

বেরেটা ধরা হাতটা ওয়াল্টারের শরীরের পাশে ঢিলে ভঙ্গিতে ঝুলছে, পিস্তলটা ধরে আছে অবহেলার সাথে। কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা লেদার ব্যাগ খুলল মারকুয়েজ, ভেতর থেকে বের করল একপ্রস্থ রশি। লোক দু'জনকে এত দ্রুত আর শক্ত করে বেঁধে ফেলল সে, বুঝতে অসুবিধে হয় না দীর্ঘদিন চর্চার ফলে আশ্চর্য দক্ষতা অর্জন করেছে এই কাজে। তার কাজ শেষ হতে একটা কাবার্ড খুলল ওয়াল্টার, ভেতর থেকে একজোড়া স্যুট বের করল, তার একটা মারকুয়েজকে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'গায়ে হয় কিনা দেখো।'

গায়ে তো স্যুটগুলো হলোই, হ্যাটগুলোও হলো মাথায়। হ্যাট বা স্যুট ছোট-বড় হলেই বরং আশ্চর্য হত ওয়াল্টার। বস্ সম্পর্কে জানা আছে তার, মিস্টার কবীর চৌধুরী আগেই সব তথ্য যোগাড় করে রাখেন, যাতে কাজের সময় কোন অসুবিধেতে পড়তে না হয়।

ছয় ফিট লম্বা একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পরীক্ষা করল মারকুয়েজ। চেহারায় ক্ষীণ একটু বিষণ্ণ ভাব ফুটল, বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, 'আমার আসলে আইনের লোক হওয়াই উচিত ছিল। দেখো না, ইউ.এস. নেভীর একজন লেফটেন্যান্টের স্যুট কি চমৎকার মানিয়ে গেছে আমাকে।' ঘাড় ফিরিয়ে ওয়াল্টারের দিকে তাকাল সে। 'তোমাকেও কিন্তু দারুণ মানিয়েছে।'

বন্দীদের একজন জানতে চাইল, 'এই ইউনিফর্ম তোমরা কেন চু…' নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে উচ্চারণ করল সে, 'এই ইউনিফর্ম কেন দরকার তোমাদের?'

'বোকাদের নিয়ে এই এক জ্বালা! ইউনিফর্ম কেন দরকার, এই সহজ কথাটা মাথায় ঢুকছে না?'

বন্দী লোকটার চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে উঠল, 'তার মানে, তুমি বলতে চাইছ…'

'হ্যাঁ। এবং তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, সিকোরস্কি, আমরা তোমাদের চেয়ে ভালই চালাতে পারি।'

'কিন্তু ইউনিফর্ম! এ-জিনিস তো তোমরা বানিয়েও নিতে পারতে! এত ঝুঁকি নেয়ার কি দরকার ছিল!'

'তোমাদের সাথে কিছু ডকুমেন্ট থাকে—আইডেনটিফিকেশন, লাইসেন্স ইত্যাদি। ওগুলোও আমাদের দরকার।' ওয়াল্টার তার সদ্য পরা স্যুটের পকেটে চাপড় দিল। 'এতে নেই। কোথায় আছে?'

অপর বন্দী বলল, 'পচে মরো, জাহান্নামে যাও!'

ওয়াল্টার উত্তেজিত হলো না। বলল, 'তোমরা এখন অসহায়। বেয়াদবি করলে মারব। কথা শুনলে আদর হয়তো করব না, কিন্তু টরচারের হাত থেকে বেঁচে যাবে। কোথায়?'

প্রথম লোকটা বলল, 'নেভী ওগুলোকে ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট বলে মনে করে। আমাদের ওপর হুকুম ছিল, তাই কাগজপত্র সব ম্যানেজারের সেফে জমা রেখেছি।'

অসহায় ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াল্টার। 'কি জ্বালাতন, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ কেন!'

'বিশ্বাস না করলে…'

প্রথম বন্দীকে বাধা দিয়ে ওয়াল্টার বলল, 'কাল সন্ধের সময় এই হোটেলে উঠেছ তোমরা। রিসেপশনিস্টের পাশে একটা আর্মচেয়ারে কে বসেছিল, মনে আছে?'

'কে?'

'লালচুলো একটা মেয়ে? সুন্দরী? মনে পড়ে?'

বন্দীরা চট করে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল। বোঝা গেল, মনে পড়েছে।

'মেয়েটা ফিরে খেয়ে বলেছে, তোমরা কেউই কিছু জমা রাখোনি। কাজেই, তোমরা মিথ্যে কথা বলছ।'

'সত্যি-মিথ্যে বুঝি না,' দ্বিতীয় বন্দী বলল, 'ডকুমেন্ট তোমরা পাবে না।'

ওয়াল্টার এমন ভাবে শুরু করল, লোকটার কথা যেন শুনতেই পায়নি। 'তোমাদের সামনে তিনটে পথ খোলা আছে। হয় বলবে। না হয় আমরা তোমাদের মুখ বেঁধে মারধর করার পর বলবে কিংবা, আমরা সার্চ করব, তোমরা দেখবে—অবশ্য, তখনও যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।'

প্রথম বন্দীকে নার্ভাস দেখাল। 'তোমরা কি আমাদেরকে…মানে, খুন করতে চাও?'

'কেন, খুন করব কেন?' সত্যি সত্যি যেন আকাশ থেকে পড়ল মারকুয়েজ।

'আমরা পুলিসের কাছে যাব,' দ্বিতীয় বন্দী বলল, 'আবার দেখলে তোমাদের চিনতে পারব।'

'তোমরা আর আমাদের দেখবে না।'

'কিন্তু মেয়েটাকে? ওকেও আমরা চিনতে পারব···'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ওয়াল্টার। 'সে তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে।' মারকুয়েজের দিকে তাকাল সে। 'যন্ত্রপাতি বের করো। এভাবে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

লেদার ব্যাগ থেকে এক জোড়া সরু মুখের প্লায়ার্স বের করল মারকুয়েজ। 'অত্যন্ত দুঃখের সাথে তোমাদের মুখে টেপ লাগাতে যাচ্ছি আমি···।'

বন্দীরা আবার পরস্পরের দিকে তাকাল। প্রথম জন এদিক ওদিক মাথা নাড়ল, দ্বিতীয় লোকটা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। প্রথমজন বলল, 'ভাগ্যে যা আছে তা তো ঘটবেই। শুধু শুধু নিজের চেহারা নষ্ট করতে যাই কেন?'

'এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা!'

'কার্পেটের তলায়। দরজার কাছে।'

কার্পেটের নিচেই পাওয়া গেল ডকুমেন্টগুলো, দুটো ওয়ালেটের ভেতর। ওয়ালেট খুলে ভেতরের কাগজপত্র দ্রুত পরীক্ষা করল ওয়াল্টার আর মারকুয়েজ। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। দুটো ওয়ালেটেই বেশ কিছু ডলার রয়েছে, সেগুলো বের করে টেবিলের ওপর রাখল তারা।

তাই দেখে রাগে গর গর করে উঠল দ্বিতীয় বন্দী, বলল, 'চোর হলেও লোক তোমরা খারাপ নও!'

'ভুল করলে,' সবিনয়ে বলল মারকুয়েজ। 'আমরা চোর নই—ডাকাত। অল্পে সন্তুষ্ট নই, তাই ডলারগুলো নিচ্ছি না।' কথা শেষ করে স্যুটের পকেট থেকে আরও কিছু ডলার বের করে টেবিলের ওপর রাখল সে। ওয়াল্টারও তাই করল।

টেবিলের ওপর প্রায় এক হাজার ডলার জমল। বন্দীরা আবার দৃষ্টি বিনিময় করল। একজন বলল, 'এত টাকা, আর তোমরা বলছ অল্প!'

'আমাদের নজর আরও বড়।'

হাতে প্লায়ার্স নিয়ে বিছানার দিকে এগোল মারকুয়েজ। 'এবার তোমাদের মুখ বন্ধ করব।'

বন্দীদের চোখে আতঙ্ক আর সন্দেহ ফুটে উঠল। একজন বলল, 'কিন্তু এইমাত্র বললে···' বিছানার ওপর উঠে বসার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে।

'ভয় পেয়ো না। মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকলে গুলি করতাম, সাইলেন্সার থাকায় কোন শব্দ হত না। ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে গেলেই চিৎকার করে লোক জড়ো করবে, তা হতে দিই কিভাবে? কিছু না, মুখে শুধু টেপ লাগাব।'

বন্দীদের মুখ বন্ধ করার পর ওয়াল্টার বলল, 'আমরা যে কাপড়গুলো রেখে যাচ্ছি, ওগুলো পরো তোমরা। ইউ. এস. নেভীর অফিসাররা শুধু আন্ডারঅয়্যার পরে রাস্তায় বেরুবে,' শিউরে উঠল সে, 'ভাবা যায় না!'

'আমরা চলে যাবার পর তোমরা ক্যাঙ্গারু নাচ নাচবে, জানি,' বলল

মারকুয়েজ। লেদার ব্যাগ থেকে একটা গ্যাস গান বের করল সে। 'কিন্তু তা আমরা চাই না। আমরা চাই, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক শান্তিতে ঘুমাও তোমরা। দুঃখিত,' বলে গ্যাস গানের ব্যারেল বন্দীদের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ট্রিগার টেনে দিল।

কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল ওরা। দরজার গায়ে ঝুলিয়ে দিল একটা নোটিস, তাতে লেখা, বিরক্ত করবেন না। এরপর তালার ভেতর প্লায়ার্স ঢুকিয়ে জোরে চাড় দিল মারকুয়েজ, তালার কলকজা চ্যাপ্টা হয়ে গেল। চাবি দিয়েও ওটাকে আর খোলা যাবে না, দরজা খুলতে হলে তালা ভাঙতে হবে।

নিচে নেমে এসে রিসেপশন ক্লার্কের দিকে এগোল ওরা। অল্প বয়স, প্রফুল্ল বদন। ওদেরকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হাসির সাথে সুপ্রভাত জানাল।

'কাল রাতে আপনার ডিউটি ছিল না,' মন্তব্য করল ওয়াল্টার।

'ছিল না, স্যার। ম্যানেজমেন্ট বিশ্বাস না করলেও, আসলে ডেস্ক ক্লার্কেরও মাঝে মধ্যে এক-আধটু ঘুম দরকার হয়।' হঠাৎ তার চেহারায় কৌতূহল ফুটে উঠল। 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করব, স্যার?'

'কি প্রশ্ন?' ওয়াল্টারকে একটু সতর্ক দেখাল।

'আপনারাই তো প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রার ওপর হেলিকপ্টার নিয়ে পাহারায় থাকবেন, তাই না?'

ওয়াল্টার হাসল। 'হ্যাঁ। এটা কোন গোপন ব্যাপার নয়। কাল রাতে আমাদের নামে একটা অ্যালার্ম কল এসেছে—কার্টার আর মারটিন। কলটা কি রেকর্ড হয়ে গেছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'শুনুন,' গলার স্বর হঠাৎ খাদে নামিয়ে বলল ওয়াল্টার, 'কাজটা উচিত হচ্ছে না, তবু নেভীর কিছু জিনিস কামরায় রেখে যাচ্ছি আমরা। ওখানে কারও ঢোকা চলবে না। কাজ থেকে ফিরতে ঘণ্টা তিনেক লাগবে আমাদের। আপনি যদি কথা দেন...'

'অবশ্যই কথা দিচ্ছি, আপনাদের কামরার ধারে কাছে যাবে না কেউ। এখুনি একটা নোটিস...'

'সেটা আমরা ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছি।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথম যে টেলিফোন বুদ পেল তার পাশে থামল ওরা। মারকুয়েজের কাছ থেকে লেদার ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢুকল ওয়াল্টার। ব্যাগ থেকে একটা ওয়াকি-টকি বের করে সুইচ অন করল।

ড্যালি সিটির উত্তরে বাতিল গ্যারেজের ভেতর অপেক্ষা করছিল কবীর চৌধুরী। যোগাযোগ হতে ওয়াল্টার জানতে চাইল, 'এস-ওয়ান?'

'ইয়েস?'

'ও. কে.।'

'গুড। জায়গায় চলে যাও।'

সান ফ্রান্সিসকো থেকে উপসাগরের উত্তরে ম্যারিন কাউন্টি, জায়গাটার নাম

সসেলিটো। সসেলিটো থেকে অনেকটা ওপরে পাহাড়ী এলাকা, কেবিনগুলো একটার কাছ থেকে আরেকটা বহু দূরে, খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। এই রকম একটা কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ওরা ছয়জন। দেখে মনে হতে পারে, খেটে খাওয়া লোকের একটা দল। চারজনের পরনে ওভারঅল, নোংরা হয়ে আছে। বাকি দু'জনের গায়ে রঙ ওঠা রেনকোট। তোবড়ানো একটা স্টেশন ওয়াগনে চড়ে শহরের দিকে রওনা হলো তারা। তাদের দক্ষিণে গোল্ডেন গেট ব্রিজ আর সান ফ্রান্সিসকো, দিনের প্রথম রোদ লেগে ঝলমল করছে আকাশ ছোঁয়া সার সার অট্টালিকা।

মেইন রোডে উঠে এল স্টেশন ওয়াগন। নোঙর ফেলা কয়েকশো জলযান আর বোটহাউসকে পাশ কাটিয়ে এল ড্রাইভার, ঢুকে পড়ল একটা সাইড রোডে। ওয়াগন থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল সে। পাশের লোকটাকে নিয়ে রাস্তায় নেমেই গা থেকে খুলে ফেলল রেনকোট, সাথে সাথে ইউনিফর্ম পরা ক্যালিফোর্নিয়ার স্টেট পেট্রলম্যান হয়ে গেল দু'জন। ড্রাইভারের নাম রজার হীল, পরনে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম। লোকটা ছয় ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা, মোটাসোটা, লালমুখো, চোখ দুটো যেন কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাকে দেখে পুলিস বলেই মনে হয়, যদিও পুলিসের সাথে তার সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। তার সঙ্গী, বব ইয়ং, সে-ও বেশ লম্বা, তবে মোটা নয়। ববের মুখে অনেকগুলো কাটাকুটির দাগ, বেশিরভাগই ধারাল ছুরির ডগা থেকে তৈরি হয়েছে। সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকে রাখা তার একটা বদভ্যাস।

পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। একটা বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল এলাকার পুলিস স্টেশনে। কাউন্টারের পিছনে দু'জন পুলিসকে দেখা গেল। একজন যুবক, অপরজন তার বাপের বয়েসী। দু'জনকেই ক্লান্ত আর ম্লান দেখাচ্ছে। তাদের লম্বা ডিউটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, খানিক পরই বাড়ি ফিরে ঘুম দেবে। সার্জেন্ট আর পেট্রলম্যানকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তারা। হাসি হাসি চেহারা করল, কিন্তু চোখে প্রশ্ন।

'গুড মর্নিং, গুড মর্নিং,' রসিক অফিসারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো রজার হীল। 'আমি সার্জেন্ট হীল, সাথে পেট্রলম্যান ইয়ং।' পকেট থেকে টাইপ করা একটা কাগজ বের করে চোখ বুলাল সে। 'তোমরা নিশ্চয়ই হাউসেন আর ফগেল? চেহারায় কিছুটা মিল আছে, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই বাপ-বেটা নও।'

'জ্বী, না,' বলল হাউসেন। যুবকের কথায় টেক্সাসের আঞ্চলিক টান। 'কিন্তু আপনি আমাদের নাম জানলেন কিভাবে?'

হাউসেনের মুখের সামনে হাতের কাগজটা একবার দোলাল হীল। 'এতে আছে।' হাসি খুশি চেহারায় একটু গাম্ভীর্যের ছাপ পড়ল। 'বোঝা গেল, আমরা যে আসছি, তোমাদের বস্ সেটা তোমাদেরকে জানায়নি। ব্যাড, ভেরি ব্যাড। ব্যাপারটা আজ সকালের মোটর শোভাযাত্রা নিয়ে। ফাইনাল চেক-আপ করতে বেরিয়ে এমন সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড চোখে পড়ল, ইচ্ছে করলে এমন রিপোর্ট দিতে পারি, একটারও চাকরি থাকবে না। এই রাজ্যে বেশিরভাগ পুলিস হয় অশিক্ষিত, নয় পাথর—কানে শুনতে পায় না।'

বয়স্ক ফগেল সবিনয়ে শুরু করল, 'সার্জেন্ট, আমরা কি দোষ করেছি তা যদি জানতে পারি…'

'দোষ? তোমরা? না-না, তোমরা কেন দোষ করবে, সব আমার কপালের লিখন! তা না হলে ভোর অন্ধকার থাকতে কাজে বেরিয়েছি, এখনও পেটে দানাপানি পড়ল না কেন!' কাগজের ওপর আরেকবার চোখ বুলাল সে। 'চারটে জিনিস ঠিক আছে কিনা জানতে চাই আমি।'

'জ্বী, বলুন!'

'দিনের প্রথম পালা বদলের সময়। তারা ক'জন আসে পেট্রল কারগুলো কোথায় সেলগুলোর কি অবস্থা।' মুখস্থই ছিল হীলের; তবে অভিনয়টা নিখুঁত করার জন্যে কাগজে চোখ রেখে প্রশ্নগুলো করল সে।

'আর কিছু না?'

'না এখানে আমি দু'মিনিটের বেশি নষ্ট করতে রাজি নই। সেই রিচমন্ড পর্যন্ত সবক'টা পুলিস স্টেশনে যেতে হবে আমাকে। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।'

'পালা বদল সকাল আটটায়,' বলল হাউসেন। 'এমনি সময়ে চারজন আসে, আজ আসবে আটজন। কারগুলো…' বাধা পেয়ে থেমে গেল সে।

'চলো, দেখব।'

বোর্ড থেকে চাবি নামাল ফগেল। ওদেরকে পথ দেখিয়ে গ্যারেজে নিয়ে এল সে। চকচকে এক জোড়া পুলিস কার, যেন এইমাত্র শো-রুম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। একজন প্রেসিডেন্ট, একজন কিং আর একজন প্রিন্স এই পুলিস স্টেশনের এলাকা দিয়ে যাবেন, তাই ঘষে-মেজে রঙ লাগিয়ে নতুন করে তোলা হয়েছে গাড়ি দুটোকে।

'ইগনিশন কী?'

'ইগনিশনে।'

অফিসরুমে ফিরে এসে প্রবেশ পথের দিকে তাকাল হীল, জানতে চাইল, 'চাবি?'

'জ্বী?'

চোখ বুজে একটু হাসল হীল, বলল, 'বলেছি না, পাথর!' তারপর চোখ মেলে কটমট করে তাকাল। 'আমিও জানি, দরজায় কখনোই তালা লাগানো হয় না। কিন্তু আজ সকালে মুহূর্তের নোটিসে তোমাদের সবাইকে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হতে পারে। তখন? তোমরা কি স্টেশন খোলা রেখেই বেরিয়ে পড়বে?'

'ও, আচ্ছা,' বলে বোর্ডের দিকে হাত তুলে একটা চাবি দেখাল ফগেল।

'এবার, সেল দেখব।'

চাবি হাতে হীলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ফগেল। একটা প্যাসেজ ধরে খানিক এগিয়ে বাঁক নিল ওরা, এখন আর অফিস থেকে ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না। সেলের সামনে দাঁড়াল ফগেল।

'ভেতরে ঢুকব।'

সেলের তালা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ফগেল। ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাল হীল, তারপর এক কোণে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে তাকাল সিলিঙের দিকে।

'ওটা কি?'

তাড়াতাড়ি সেলের ভেতর ঢুকে হীলের পাশে দাঁড়াল ফগেল, ওপর দিকে তাকিয়ে এক সেকেন্ড পর বলল, 'ঝুল।'

'ঝুল? ঝুল কোত্থেকে এল?'

'মাকড়সার জালে ধোঁয়া লেগে...'

'ধোঁয়া? সেলের ভেতর ধোঁয়া আসে কোত্থেকে?' কঠিন সুরে জানতে চাইল হীল।

'জ্বী, মানে, হাজতিরা সিগারেট খায় তো...'

পকেট থেকে একটা হাত বের করল হীল, 'কিন্তু তুমি খাবে গুলি,' হাতের রিভলভারটা ফগেলের পাঁজরে চেপে ধরে বলল সে, 'যদি এই সেল থেকে বেরুবার চেষ্টা করো।'

হাঁ হয়ে গেল ফগেল। হাঁ-টা আরও একটু বড় হলো হাউসেনকে দেখে। তার পিঠে রিভলভার ধরে সেলের ভেতর ঢুকছে বব ইয়ং।

বন্দীদের মুখের ভেতর তুলো ভরে ঠোঁটে টেপ লাগিয়ে দেয়া হলো। লোহার বার-এ পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে বসানো হলো, দুই বারের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে বের করে নিয়ে এসে দু'জোড়া হাতে লাগিয়ে দেয়া হলো হাতকড়া। হাতকড়ার চাবি পকেটে ভরল হীল। অফিস কামরায় ফিরে এসে বোর্ড থেকে আরও দু'সেট চাবি নিয়ে পকেটস্থ করল সে। তারপর ববের পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগাল। দরজার চাবিও চলে গেল তার পকেটে। উঠান ঘুরে এবার ওরা ফিরে এল গ্যারেজে। গাড়ি দুটো বের করল। গ্যারেজের দরজায় তালা লাগাবার জন্যে রয়ে গেল হীল, সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে আসার জন্যে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল বব।

তারা চারজন যখন স্টেশনে ঢুকল, দেখে তখন আর খেটে খাওয়া মানুষ বলে মনে হলো না। পরনে ওভারঅল নেই, চারজনই এখন-ইউনিফর্ম পরা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট পেট্রল।

ওদেরকে নিয়ে ইউএস একশো এক ধরে উত্তর দিকে ছুটল জোড়া পুলিস কার। তারপর বাঁক নিয়ে স্টেট ওয়ান ধরে পশ্চিম দিকে। মাউন্ট টামালপাইজ স্টেট পার্কে থামল ওরা। পকেট থেকে ওয়াকি-টকি বের করল হীল, জিনিসটা তার ইউনিফর্মের সাথে চমৎকার মানিয়ে গেছে। বোতাম টিপে বলল, 'এস-ওয়ান?'

বাতিল গ্যারেজে এখনও অপেক্ষা করছে কবীর চৌধুরী। 'ইয়েস?'

'ও. কে.।'

'গুড। থাকো।'

নব হিল-এর মাথায় বিলাসবহুল পাঁচতারা একটা হোটেল, কাল রাতটা এখানেই কাটিয়েছেন মেহমানরা। ডিনারের পর গভীর রাত পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা হয়েছে তাঁদের। তেল নিয়ে আলোচনার আমন্ত্রণ পেয়ে দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তাঁরা, কিন্তু সে-প্রসঙ্গে আলোচনা এখনও শুরুই হয়নি। কাল রাতে প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল মধ্যপ্রাচ্যের

রাজনীতি। চলতি দুনিয়ায় যার তেল আছে তাকেই সবাই তেল মাখায়, এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের চীফ এগজিকিউটিভ-ও এই রীতি ভাঙতে চান না। মেহমানদের খুশি করার জন্যে রাতটা তিনি তাঁদের সাথে এই হোটেলেই কাটিয়েছেন।

মাত্র সকাল হয়েছে হোটেলের উঠান আর সামনের রাস্তা এক রকম নির্জনই বলা যায়। সব মিলিয়ে মাত্র সাতজন লোককে দেখা গেল। তাদের ছয়জন হোটেলের সামনের সিঁড়িতে রয়েছে। বাকি একজন রাস্তায়।

সাত নম্বর লোকটা প্রায় ছয় ফিট লম্বা, সুদর্শন, তার হাবভাবে বুদ্ধিমত্তা আর ক্ষিপ্রতার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। জুলফি এবং কানের ওপর কিছু কিছু চুলে পাক ধরলেও, চেহারা থেকে তারুণ্যের ভাব এখনও অদৃশ্য হয়নি। শান্ত ধীর ভঙ্গিতে রাস্তায় পায়চারি করছে সে।

বাকি ছয়জন লোক তাকে লক্ষ্য করে নিজেদের মধ্যে ঘন ঘন দৃষ্টি বিনিময় করছে। এদের মধ্যে দু'জন হলো গেট-কীপার, দু'জন পুলিস, বাকি দু'জন সাদাপোশাকে এফ.বি.আই.। এফ.বি.আইদের গায়ে কোট, দু'জনেরই বাঁ দিকের বগলের কাছটা কেমন বেঢপ ভাবে ফুলে আছে।

সাত নম্বর লোকটাকে নিয়ে দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে ওরা। একজন নাগরিক যদি রাস্তায় পায়চারি করে, সেখান থেকে তাকে চলে যেতে বলার কোন আইন নেই। কিন্তু নিখুঁত ভাবে দায়িত্ব পালন করতে হলে লোকটাকে ওখানে থাকতে দেয়াও চলে না। কাজেই কি করা যায় ঠিক করার জন্যে নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শুরু করল তারা। ঠিক হলো, ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে গিয়ে লোকটার সাথে কথা বলবে। বুঝিয়ে, অনুরোধ করে বা অন্য যে-কোন উপায়ে লোকটাকে ওখান থেকে সরাতে হবে।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এল ইউনিফর্ম। পায়চারি রত লোকটার সাথে হাঁটতে শুরু করে বলল, 'গুড মর্নিং, স্যার। কিছু যদি মনে না করেন, স্যার,··· বোঝেনই তো···ইয়ে, আপনি যদি অন্য কোথাও গিয়ে হাওয়া খান···মানে, এখানে আমরা একটা দায়িত্ব পালন করছি তো···'

লোকটা বাধা দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আমিও যে একটা দায়িত্ব পালন করছি না, কে বলল তোমাকে?'

'স্যার, প্লীজ! ব্যাপারটা আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন। হোটেলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা রয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তা···'

'হ্যাঁ, তাঁদের নিরাপত্তা!' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা। 'তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তোমরা সবাই উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমিও কি কম উদ্বিগ্ন?' কোটের ভেতরের পকেটে হাত গলিয়ে ওয়ালেট বের করল সে, সেটা মেলে ধরল ইউনিফর্মের চোখের সামনে।

ওয়ালেটের ভেতর কার্ডটা দেখে প্রথমে ইউনিফর্মের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, তারপর ঝুলে পড়ল মুখ। ঢোক গিলল সে। কালো ছায়া পড়ল চেহারায়। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে দু'একবার তোতলাল। 'আ-আমি দুঃখিত, স্যা-স্যার, মি. রোজেন, স্যার!'

'দুঃখিত আমিও। দুঃখিত আমেরিকার জন্যে, দুঃখিত যাদের তেল নেই

তাদের সবার জন্যে। ওহ্ গড, কি একখানা সার্কাস!' ইউনিফর্ম পরা অফিসারের চেহারা যতক্ষণ না সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠল ততক্ষণ কথা বলে গেল সে। পায়চারি কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও থামেনি।

ধাপ বেয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠে গেল অফিসার। খোঁচা মারা ব্যঙ্গাত্মক হাসির সাথে একজন এফ.বি.আই. বলল, 'খুব দেখিয়েছ! সামান্য একজন লোককে হটাতে পারো না, তাহলে ভিড় সরাবে কিভাবে?'

'তুমি নাহয় একবার চেষ্টা করে দেখো না।'

তাচ্ছিল্যের সাথে হাসল এফ.বি.আই.। বলল, 'এটা আবার একটা কাজ নাকি। ঠিক আছে, তুমি যখন দেখতেই চাও, যাচ্ছি।' সিঁড়ির তিনটে ধাপ নেমে থমকে দাঁড়াল সে, ঘাড় ফিরিয়ে পুলিস অফিসারের দিকে তাকাল। 'আচ্ছা, লোকটা তোমাকে কি যেন দেখাল—কার্ড?'

'কার্ড,' মুচকি হেসে বলল পুলিস অফিসার।

'কে?'

'হাসালে দেখছি!' খোঁচা মারা ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে প্রতিশোধ নিল পুলিস অফিসার। 'তুমি কেমন এফ.বি.আই. হে, নিজের ডিপুটি ডিরেক্টরকে চিনতে পারো না?'

'জেসাস!' এফ.বি.আই.-এর চোখের পলকে সিঁড়ির মাথায় ফিরে আসাটা অলৌকিক একটা ব্যাপার বলে মনে হলো।

'কি হলো,' অবাক হবার ভান করল পুলিস অফিসার। 'ভদ্রলোককে হটাবে না?'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে থমথমে হয়ে উঠল এফ.বি.আই.-এর চেহারা। ভারী গলায় বলল, 'এখন থেকে এ ধরনের ছোটখাট কাজ ইউনিফর্মদের ওপর ছেড়ে দিলাম আমি।'

একজন বেল-বয়, মাঝ-বয়েসী, সিঁড়ির মাথায় উদয় হলো। খানিক ইতস্তত করল সে, তারপর ধাপ বেয়ে নেমে এল রাস্তায়। পায়চারি থামিয়ে তাকে কাছে আসার জন্যে হাত নেড়ে উৎসাহ দিল ব্যারি রোজেন। লোকটার মুখে বয়সের ছাপের সাথে যোগ হয়েছে দুশ্চিন্তার গভীর কয়েকটা রেখা। কাছে এসে বলল, 'আপনি কি স্যার ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিচ্ছেন না? সিঁড়িতে ওদের সাথে এফ.বি.আই.-ও রয়েছে।'

'কোথায় ঝুঁকি?' রোজেন সকৌতুকে হাসল। 'ওরা দু'জন ক্যালিফোর্নিয়া এফ.বি.আই., আর আমি ওয়াশিংটন। খোদ ডাইরেক্টর জেনারেলও যদি ওদের কোলের ওপর এসে বসে, ওরা চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। কি খবর নিয়ে এসেছ, বুলি?'

'তাঁরা সবাই তাঁদের স্যুটে ব্রেকফাস্ট সারছেন, ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়নি কারও।'

'দশ মিনিট পর পর খবর চাই আমি।'

'জ্বী, স্যার। আপনি বলছেন বটে ঝুঁকি নেই, কিন্তু আমার কেমন যেন লাগছে। হোটেলের ভেতরের অবস্থা কি, জানেন? এফ.বি.আই. গিজ গিজ করছে। সকাল থেকে ছয় বার চেক করা হয়েছে আমাকে। এক অফিস থেকে আরেক অফিসে

যেতে হলে ম্যানেজারকেও থামানো হচ্ছে। আর, ওই যে জানালাগুলো দেখছেন, প্রতিটি জানালার পিছনে একটা করে রাইফেল, প্রতিটি রাইফেলের পিছনে একজন করে স্নাইপার।'

হাসি হাসি মুখ করে রোজেন বলল, 'আমি জানি, বুলি। ঝড়ের ঠিক মধ্যিখানটায় রয়েছি আমি, যেখানে বাতাসের কোন উপদ্রব নেই। আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'কিন্তু যদি একবার ধরা পড়েন…'

'পড়ব না। আর যদি পড়িও, তোমার কোন ভয় নেই।'

'কি বলছেন ভয় নেই! আপনার সাথে কথা বলছি, সবাই দেখছে না?'

'কেন? কারণ আমি এফ.বি.আই.। কথাটা আমি বলেছি তোমাকে। তুমি অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখোনি। সিঁড়ির মাথায় ওরা ছয়জনও ঠিক তাই বিশ্বাস করে—আমি এফ.বি.আই.। তাছাড়া, বুলি, ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টের বরাত দিয়ে আবেদনের সুযোগ তো খোলাই থাকবে তোমার।'

বুলি বিদায় নিল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো ছয়জন লোকের চোখের সামনে পকেট থেকে একটা ওয়াকি-টকি বের করল রোজেন। 'এস-ওয়ান?'

'ইয়েস?' কবীর চৌধুরীর নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর

'যথাসময়েই।'

'গুড। এস-ওয়ান এখন রওনা হচ্ছে। প্রতি দশ মিনিটে একবার। রাইট?'

'রাইট স্যার। আমার যমজের খবর কি, স্যার?'

কোচের পিছন দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। মুখ আর হাত বাঁধা লোকটা দু'ধারের আসনের মাঝখানে পড়ে আছে, তার আর রোজেনের চেহারায় আশ্চর্য মিল।

'বাঁচবে।'

দুই

প্রকাণ্ড কোচটাকে ধীরেসুস্থে দুশো আশি নম্বর রোডে তুলে নিয়ে এল রস পেরট, তারপর সাউদার্ন ফ্রিওয়ে ধরে উত্তর-পুব দিকে ছুটিয়ে দিল। কোন কোন মানুষকে দেখলেই মনে হয়, বাঘ। সেই দুর্লভদের মধ্যে রস পেরট একজন। বিশাল রয়েল বেঙ্গল টাইগার নয়, একটু বরং খাটোই বলা যায়, কিন্তু গাঁট্টাগোট্টা। কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল খুলি কামড়ে আছে, মাথাটা হুবহু কুমড়ো আকৃতির। কান আর মাথার মাঝখানে কোন ফাঁক নেই, মনে হয় খুলির সাথে ও-দুটো যেন সাঁটা। নাকটা বেশ বড়, কিন্তু চ্যাপ্টা; সন্দেহ নেই অতীতে শক্ত ভারী কিছুর সাথে ওটার সংঘর্ষ হয়েছিল। তার একটা প্রবণতা হলো, জেগে থাকা অবস্থায় চেহারায় উদাস, বিষণ্ন একটু হাসি ধরে রাখা, যেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই অনিশ্চিত পৃথিবীতে তার

চারপাশে যে অসংখ্য অনিশ্চিত ঘটনা ঘটছে তা থেকে গা বাঁচাবার এটাই সবচেয়ে নিরাপদ চাতুরী। মায়াভরা নীল চোখ, দেখে কখনোই মনে হবে না এই চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিপাত সম্ভব। এ চোখ যেন সমাধানের অযোগ্য জীবনের নানান জটিলতায় হতভম্ব একজন লোকের চোখ। কিন্তু কুমড়োর ভেতর তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে রস পেরট, আর তাই খুব বেশিদিনের পরিচয় না হলেও অতি দ্রুত কবীর চৌধুরীর ডান হাত হয়ে উঠতে পেরেছে সে।

কোচের সামনে বসে আছে দু'জন। দু'জনের পরনেই লম্বা সাদা কোট। প্রেসিডেনশিয়াল মোটর শোভাযাত্রায় যারা ড্রাইভারের দায়িত্ব পালন করবে তাদের জন্যে এই পোশাক নির্ধারণ করেছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, জ্যাকেট পরা বা আস্তিন গুটানো ভাল চোখে দেখে না তারা।

সান ফ্রান্সিসকোর পথ-ঘাট এখনও ভাল করে চেনা হয়ে ওঠেনি কবীর চৌধুরীর, তাই কোচ চালাবার দায়িত্ব পড়েছে রস পেরটের ওপর। এখানেই তার জন্ম। গাড়ি না চালালেও, রস পেরটের চেয়ে কম ব্যস্ত নয় কবীর চৌধুরী। তার সামনে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির একটা প্যানেল রয়েছে, একটা বোয়িং-এর কন্ট্রোল প্যানেলের সাথে খুব সামান্যই অমিল পাওয়া যাবে এর। কমিউনিকেশন সিস্টেম হিসেবে প্রেসিডেনশিয়াল কোচে যা আছে তার সাথে এটার তুলনা চলে না, কিন্তু কবীর চৌধুরীর যা দরকার তার সবই এতে আছে। বরং, কয়েকটা যন্ত্রপাতির মান নিজ হাতে আরও উন্নত করে নিয়েছে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের সীটে বসা লোকটার দিকে একবার তাকাল কবীর চৌধুরী। চার্লি ব্রাউন একজন নিগ্রো, মানুষের চেয়ে ভালুকের সাথেই যেন তার সাদৃশ্য বেশি। শান্ত মেজাজের লোক, কখনোই ধৈর্য হারায় না, কবীর চৌধুরীর একান্ত বিশ্বস্ত শিষ্য।

'প্লেট, চার্লি? এনেছ?'

চার্লির মাথার চুল আর ভুরুর মাঝখানে নগণ্য একটু খালি জায়গা নিয়ে কপাল, সেখানে কয়েকটা রেখা ফুটল। এর অর্থ, একাগ্র মনোযোগের সাথে কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করছে সে। এক সেকেন্ড পর কালো মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটল। 'ইয়েস, স্যার! এনেছি, স্যার।' সামনের দিকে ঝুঁকে সীটের তলা থেকে স্প্রিং-ক্লিপ লাগানো একজোড়া নাম্বার প্লেট তুলল সে। প্রেসিডেনশিয়াল মোটর শোভাযাত্রায় যে কোচ তিনটে ব্যবহার করা হবে সেগুলোর সাথে কবীর চৌধুরীর কোচের বাইরের চেহারার কোন অমিল নেই, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সরকারী কোচে রয়েছে ওয়াশিংটন ডি.সি. প্লেট, আর তারটায় রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া প্লেট। চার্লির হাতে যে প্লেট রয়েছে সেটা ওয়াশিংটনের, সরকারী গ্যারেজে অপেক্ষারত তিনটে কোচের একটার নম্বর আর তার হাতের প্লেটের নম্বর একই।

'ভুলো না,' বলল কবীর চৌধুরী। 'সামনের দরজা দিয়ে আমাকে নামতে দেখলে তুমিও পিছনের দরজা দিয়ে নেমে যাবে। তোমার প্রথম কাজ প্লেট বদলানো।'

'আমার মনে আছে, স্যার।'

মুহূর্তের জন্যে একটা সঙ্কেত বেজে উঠল। একটা বোতামে চাপ দিল কবীর

চৌধুরী।

'এস-ওয়ান?' নব হিল থেকে জানতে চাইল ব্যারি রোজেন।

'ইয়েস?'

'যথাসময়ে। চল্লিশ মিনিট।'

'গুড।' বোতামে আরেকবার চাপ দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল কবীর চৌধুরী, তারপর আরেকটা বোতামে চাপ দিল। 'এস-ফোর?'

'এস-ফোর।'

'রওনা হও।'

চুরি করা পুলিস কারে স্টার্ট দিল লালমুখো রজার হীল। পিছনে দ্বিতীয় গাড়ি নিয়ে প্যানোরামিক হাই-ওয়েতে উঠে এল সে। গাড়ি খুব জোরে ছোটাল না, তাতে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে টামালপাইজ রাডার স্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা। রাডার স্টেশনের কোথায় কি আছে সব তাদের মুখস্থ, স্মৃতিতে জমা আছে গোটা এলাকার লে-আউট, চোখ বেঁধে দিলেও স্টেশনের যে-কোন অংশে যেতে পারবে তারা।

ছয় ফিট তিন ইঞ্চি, রজার হীল, তার সঙ্গীদের বলল, 'আমরা পুলিস, তাই না? জনসাধারণের অভিভাবক। অর্থাৎ গুলি করা চলবে না। বসের নির্দেশ।'

সঙ্গীদের একজন জানতে চাইল, 'কিন্তু পরিস্থিতি যদি বাধ্য করে?'

'তোমার ভাগের অর্ধেক টাকা কাটা যাবে।'

'আমি বাবা তাহলে গুলির মধ্যে নেই।'

আরেকটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। 'এস-থ্রী?'

এস-থ্রী চেসটন আর জ্যাকের কোড নাম্বার, যারা ঘুমন্ত গার্ডের নাকে গ্যাস ছেড়ে সরকারী কোচগুলোর একটায় উঠেছিল। সরকারী গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়েছিল ওরা। এখন আবার ফিরে এসে গ্যারেজের সামনে ডিউটি দিচ্ছে। চেসটন সাড়া দিল, 'এস-থ্রী।'

'খবর বলো।'

'শুধু দু'জন ড্রাইভার পৌঁচেছে।'

'গার্ড?'

'ঘুম থেকে উঠেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, কিছু সন্দেহ করেনি।'

'অপেক্ষা করো।'

আরেকটা সঙ্কেত ধ্বনি হতে হাত বাড়িয়ে অন্য একটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী।

'এস-ফাইভ। যথাসময়ে। ত্রিশ মিনিট।'

'গুড।'

নতুন আরেকটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। 'এস-টু?' যারা দু'জন প্রায় একই গঠনের, সেই মারকুয়েজ আর ওয়াল্টারের কোড নম্বর এটা।

'ইয়েস?'

'তোমরা এবার রওনা দিতে পারো।'

'দিলাম, স্যার,' বলল ওয়াল্টার। মারকুয়েজকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেল সে, গন্তব্য ইউ.এস. নেভী স্টেশন অ্যালামেডা। ন্যাভাল এয়ার ইউনিফর্মে সত্যি চমৎকার মানিয়েছে ওদেরকে। দু'জনেরই কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা করে ফ্লাইট ব্যাগ, লেদার ব্যাগের জিনিস-পত্র এগুলোয় ভরে নিয়ে সেটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে ওরা। নেভী স্টেশনের কাছাকাছি এসে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল, যেন খুব তাড়া আছে। স্টেশনে ঢোকার মুখে দু'জন গার্ডকে দেখল, হন হন করে হাঁটায় তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই ঘেমে গেল ওরা। একজন গার্ড দু'পা এগিয়ে এল ওদের দিকে। পকেট থেকে বের করে তাকেই ওরা কার্ড দেখাল।

'লেফটেন্যান্ট কার্টার, লেফটেন্যান্ট মারটিন। হ্যাঁ-হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা বেশ একটু দেরি করে ফেলেছেন, স্যার।'

'জানি,' বলল ওয়াল্টার। 'সরাসরি হেলিকপ্টারে যাব আমরা।'

'কিন্তু স্যার, সেটা তো নিয়ম নয়। তাছাড়া, কমান্ডার মিডো আমাকে বলে রেখেছেন, পৌঁছেই তাঁর কাছে রিপোর্ট করতে হবে আপনাদের।' নাবিক গলার স্বর হঠাৎ খাদে নামিয়ে চুপি চুপি বলল, 'কমান্ডারের মেজাজ সুবিধের মনে হলো না, স্যার।'

'অ্যাঁ! বলো কি!' সত্যি সত্যি চিন্তিত হয়ে উঠল ওয়াল্টার। 'তার অফিসটা কোন্ দিকে?'

'বাঁ দিকে, দু'নম্বর দরজা, স্যার।'

মারকুয়েজকে সাথে নিয়ে দ্রুত সেদিক এগোল ওয়াল্টার, দরজায় নক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। যুবক এক পেটি অফিসার ডেস্কের পিছনে বসে নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে তার ডান দিকের একটা দরজা দেখিয়ে দিল ওদেরকে। তার আচরণই বলে দিল, কমান্ডারের ঘরে যে অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা হতে যাচ্ছে তাতে নিজের কোন ভূমিকা চায় না সে।

নক করে ভেতরে ঢুকল ওয়াল্টার, মাথা নিচু করে আছে। খোলা ফ্লাইট ব্যাগে চোখ রেখে কিছু খুঁজছে, এই রকম ভাব। এই সাবধানতার কোন দরকার ছিল না। অধীনস্থ কর্মচারীদের কোন ত্রুটি দেখতে পেলে বড় সাহেবরা সাধারণত যা করে থাকে, কমান্ডার গ্লেন মিডোও ঠিক তাই করছিল—সামনের একটা প্যাডে ওয়াল্টার আর মারকুয়েজের নামে অভিযোগ লিখছিল সে।

ওয়াল্টারের পিছু পিছু ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল মারকুয়েজ, কোন শব্দ হলো না। ফ্লাইট ব্যাগটা ডেস্কের কিনারায় রাখল ওয়াল্টার, তার ডান হাত ব্যাগের আড়ালে পড়ে গেছে। সেই সাথে অ্যারোসল গ্যাস ক্যানটাও।

'দয়া করে এলে তাহলে?' কমান্ডার মিডো বোস্টনের লোক, গলার আওয়াজে সেখানকার তীব্র টান। 'তোমাদের ওপর কড়া হুকুম ছিল,' কথা শেষ না করে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল সে। 'জানি, অজুহাতের কোন অভাব হবে না...' হঠাৎ চোখ পিট পিট করল সে, কিন্তু এখনও অমঙ্গল কিছু আশঙ্কা করেনি। 'তোমরা কারা? তোমরা তো কার্টার আর মারটিন নও!' রাগে, বিস্ময়ে আরও লাল হয়ে

উঠল ফোলা বেলুন আকৃতির লালচে চেহারা।

'না, দেখতেই তো পাচ্ছেন, নই।'

এতক্ষণে বিপদ টের পেল কমান্ডার। ডেস্কের একটা বোতামের দিকে হাত বাড়াল সে। তার হাত বোতাম স্পর্শ করার আগেই অ্যারোসল ক্যানের বোতামে চাপ দিল ওয়াল্টার, প্রায় সাথে সাথেই ডেস্কের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল মিডো। মারকুয়েজের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল ওয়াল্টার, ইঙ্গিত পেয়ে দরজা খুলে বাইরের অফিসে বেরিয়ে গেল মারকুয়েজ, পিছনে একটা হাত নিয়ে গিয়ে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল সে, অপর হাতে ব্যাগের ভেতরটা হাতড়াচ্ছে।

ডেস্কের পিছনে চলে এল ওয়াল্টার, ফোনের নিচে বোতামগুলো পরীক্ষা করল, তারপর রিসিভার তুলতে শুরু করে চাপ দিল একটায়। 'টাওয়ার?'

'স্যার?'

'লেফটেন্যান্ট কার্টার আর মারটিনকে ইমিডিয়েট ক্লিয়ার‍্যান্স দাও,' বলল ওয়াল্টার, কথার সুরে বোস্টনের টান প্রকট।

এস-থ্রীকে আবার ডাকল কবীর চৌধুরী। চেসটন আর জ্যাক, সরকারী গ্যারেজের সামনে ডিউটি দিচ্ছে। 'খবর বলো।'

'লাইনে দাঁড়াচ্ছে, স্যার।'

সরকারী গ্যারেজের ভেতর আসলেও এক লাইনে দাঁড়াচ্ছে কোচগুলো। দুটো কোচে উঠে পড়েছে আরোহীরা, ওগুলো এখন রওনা হবার জন্যে তৈরি। চেসটন আর জ্যাক যেটায় উঠেছিল, এ-দুটোর মধ্যে সেটাও রয়েছে। এই কোচ বরাদ্দ করা হয়েছে সাংবাদিক, বেতারকর্মী আর ক্যামেরাম্যানদের জন্যে। আরোহীরা যারা উঠেছে তাদের মধ্যে মহিলা রয়েছে চারজন। তিনজনের বয়স আঁচ করা প্রায় অসম্ভব। বাকি একজন যুবতী। কোচের পিছন দিকে একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, তিনটে সিনে ক্যামেরা বসানো হয়েছে সেখানে। মোটর শোভাযাত্রায় এই কোচ সবার আগে থাকবে, তার ঠিক পিছু পিছু আসবে প্রেসিডেনশিয়াল কোচ, ফলে ভি.আই.পি.-রা সারাক্ষণ ক্যামেরার চোখে থাকতে পারবেন।

এই কোচে বিদেশী লোকও আছে। ওয়ালথার, কোল্ট, বেরেটা, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন কিংবা আর যে-সব স্মল আর্মস আছে সেগুলো দেখলেই চিনতে পারবে এমন আরোহী রয়েছে তিনজন। কিন্তু এদের পায়ের সামনে যদি একটা টাইপ রাইটার আর একটা ক্যামেরা রাখা হয়, কোন্‌টা কি চিনতে পারবে না। এই কোচের নাম দেয়া হয়েছে লীড কোচ।

এই কোচের একজন আরোহী, ক্যামেরা চিনতে কোন অসুবিধে হবে না তার। সাথে একটা রয়েছেও, যদিও সেটাকে শুধু একটা ক্যামেরা বলা সঙ্গত হবে না—অত্যন্ত জটিল একটা অ্যাপারেটাস। ওয়ালথার, কোল্ট, বেরেটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন কিংবা আর যে-সব স্মল আর্মস আছে সেগুলো দেখামাত্র শুধু যে চিনতে পারবে সে তাই নয়, কোন্‌টার কি বৈশিষ্ট্য তাও বলে দিতে পারবে। এ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র সাথে রাখার অনুমতি পায় সে, প্রায় সময় রাখেও। কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠানে সে নিরস্ত্র, প্রয়োজন হবে না মনে করে সাথে আনেনি। আগ্নেয়াস্ত্র না থাকলেও তার ক্যামেরার তলায় লুকানো রয়েছে একটা মিনিয়েচারাইজড,

ট্রানজিসটারাইজড ট্র্যানসিভার রেডিও। তার কাগজপত্র পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সে একজন ভারতীয়, নাম প্রদ্যুৎ মিত্র। লন্ডনের দ্য নিউজ পত্রিকার একজন রিপোর্টার। সত্যি এবং মিথ্যের মিশেল দেয়া তথ্য এগুলো। আসলে সে ভারতীয় নয়, বাংলাদেশী। তার নাম প্রদ্যুৎ মিত্রও নয়, শ্রীমান মাসুদ রানা। তবে দ্য নিউজের একজন রিপোর্টার বটে।

দ্য নিউজের সম্পাদক জহিরুল ইসলাম এই অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠিয়েছে রানাকে। মধ্যপ্রাচ্যের দুই কর্ণধারের সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্টের তেল-আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট করতে হবে ওকে। বলাই বাহুল্য, ছদ্মবেশ নিয়ে আছে রানা। সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেই চেনে ওকে, সেই চেনা মুখকে যদি রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেখে, সন্দেহ এবং অপ্রত্যাশিত বিপদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে-কারণেই ছদ্মবেশ।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচের পিছনে থাকবে রিয়্যার কোচ। লীড কোচের চেয়ে আরোহী সংখ্যা এতে বরং বেশি, কিন্তু রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যান মাত্র দু'একজন, বাকি সবাই এফ. বি. আই। খানিক পর মোটর শোভাযাত্রা যখন শুরু হবে, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের সাথে ফোর্ট নক্সের বিশেষ কোন পার্থক্য থাকবে না। তাই কোন কোন রিপোর্টার ভাবছে, ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশনের এত লোক এখানে না থাকলেও চলত।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে লোক রয়েছে মাত্র তিনজন, সবাই ক্রু। সাদা কোট পরা ড্রাইভার, তার 'রিসিভ' সুইচ নিচের দিকে নামানো, রেডিওর স্পীকার থেকে নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় বসে রয়েছে। বারের পিছনে রয়েছে সুন্দরী এক যুবতী, রাষ্ট্রীয় মেহমানদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে ধন্য মনে করছে নিজেকে। আরও পিছন দিকে, নিজের কমিউনিকেশন কনসোলের সামনে বসে রয়েছে রেডিও অপারেটর।

কবীর চৌধুরীর কোচে একটা সঙ্কেত বেজে উঠল।

'এস-ফাইভ,' স্পীকার থেকে ভেসে এল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'যথাসময়ে। বিশ মিনিট।'

দ্বিতীয় আরেকটা সঙ্কেত বেজে উঠল।

'এস-ফোর। সব ঠিক আছে।'

'গুড।' এই প্রথম নিজেকে একটু স্বস্তি বোধ করার অনুমতি দিল কবীর চৌধুরী। টামালপাইজ রাডার স্টেশন দখল করাটা তার প্ল্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। জানতে চাইল, 'স্ক্যানারগুলোয় লোক বসানো গেছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

আরেকটা সঙ্কেত বেজে উঠল।

'এস-ওয়ান?' উত্তেজিত সুরে জানতে চাইল ওয়াল্টার। 'এস-টু। আমরা উড়তে পারি?'

'না। বিপদ?'

'কিছুটা।' হেলিকপ্টারে এখনও স্টার্ট দেয়নি ওয়াল্টার, কন্ট্রোলের সামনে বসে

আছে। দেখল, কমান্ডার মিডোর অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক লোক, বাঁক ঘুরে বিল্ডিঙের আড়ালে চলে গেল সে? বুঝতে অসুবিধে হলো না, কমান্ডারের অফিসের দরজা খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে লোকটা, ছুটে জানালার কাছে যাচ্ছে ভেতরের দৃশ্য দেখার জন্যে। মারকুয়েজকে নিয়ে ওই অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে এসেছে ওয়াল্টার, চাবি তার পকেটেই রয়েছে।

সান্ত্বনা এইটুকু যে লোকটা জানালা দিয়ে ভেতরে তাকালেও আসল ঘটনা এখুনি কিছু টের পাবে না। কমান্ডারকে চেয়ারের ওপর ফেলে আসেনি ওরা, অচেতন কমান্ডার আর পেটি অফিসারকে বাথরুমে রেখে এসেছে। ভাগ্যই বলতে হবে, বাথরুমে কোন জানালা নেই। বাথরুমের দরজাতেও তালা দেয়া হয়েছে, সে-চাবিও তার পকেটে।

আবার বাঁক নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। এখন আর ছুটছে না। হন হন করে কয়েক পা হেঁটে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, অস্থির ভাবে চারদিকে তাকাল। লোকটা কি ভাবছে, পরিষ্কার আন্দাজ করতে পারল ওয়াল্টার। কমান্ডার এবং পেটি অফিসার হয়তো জরুরী কোন কাজে ব্যস্ত, হয়তো এই অফিসেরই অন্য কোথাও আছে তারা—এখন যদি 'বাঘ, বাঁচাও!' বলে চিৎকার জুড়ে দেয় সে, কমান্ডারের ধমকের ঠেলায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। আবার ভাবছে, কিন্তু সত্যি যদি ওদের কোন বিপদ হয়ে থাকে? নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ না করাটা তখন হয়ে দাঁড়াবে একটা অপরাধ, গালমন্দ করবে অফিসাররা। আবার পা চালাল সে, স্টেশন কমান্ডারের অফিসের দিকে যাচ্ছে, প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করবে কমান্ডার মিডো ঠিক কোথায় আছেন বা কি করছেন। খানিক দূর হেঁটেই গেল সে, তারপর আর ধৈর্য রাখতে পারল না, ছুটল।

মুখের সামনে ওয়াকি-টকি তুলে কথা বলল ওয়াল্টার, 'যতদূর বুঝতে পারছি,স্যার, বিপদ গুরুতর।'

'যতক্ষণ সম্ভব থাকতে চেষ্টা করো। ইমার্জেন্সী দেখা দিলে উঠে পড়ো আকাশে। রন্ডিভু রিমেইন্স।'

রস পেরট কবীর চৌধুরীর দিকে তাকাল। 'সমস্যা, চীফ?'

'হ্যাঁ। ওয়াল্টার আর মারকুয়েজ বিপদের ভয় করছে, এখুনি টেক অফ করতে চায়।'

'হুঁ।' চিন্তামগ্ন হলো পেরট।

'সময়ের আগেই যদি টেক অফ করে ওরা, আমাদের অপেক্ষায় মিনিট দশেক ঘুর ঘুর করতে হবে আকাশে। কল্পনা করতে পারো? প্রেসিডেন্ট এবং মিডল ইস্টের অর্ধেক তেলের দু'জন মালিক যে শহরে রয়েছে সেখানে যদি হাইজ্যাক করা দুটো হেলিকপ্টার মাথার ওপর চক্কর দিতে থাকে, তাদের পরিণতি কি আশা করতে পারো তুমি?'

চিন্তার জাল থেকে নিজেকে এখনও মুক্ত করতে পারছে না পেরট, তাই আবার একবার হুঁ করল।

'গোটা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে না?' বলে চলেছে কবীর চৌধুরী।

'সামরিক অফিসারদের চেনা আছে আমার, ওরা ভয় পেয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে ওস্তাদ। এক্ষেত্রেও কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাইবে না। হুকুম দেবে, ও-দুটোকে গুলি করে নামাও। ওদের ওই ঘাঁটিতে সদা-প্রস্তুত ফ্যান্টম আছে।'

চিন্তা করছে, সেই সাথে কোচও চালাচ্ছে পেরট। 'আমার ধারণা,' এইটুকু বলে বিরতি নিল সে, সরকারী গ্যারেজের পিছন দিকে ধীরেসুস্থে দাঁড় করাল কোচটাকে। এই গ্যারেজের ভেতরই রয়েছে মোটর শোভাযাত্রার তিনটে কোচ—লীড, প্রেসিডেনশিয়াল এবং রিয়্যার। '...এটা একটা সমস্যা হলেও, উৎকট সমস্যা নয়।'

'ব্যাখ্যা করো,' ভারি সুরে বলল কবীর চৌধুরী। পেরটের বুদ্ধির ওপর তার অগাধ আস্থা, সেজন্যেই তাকে এই অপারেশনে নিজের ডান হাত বানিয়েছে সে।

'সময়ের আগেই যদি টেক অফ করতে বাধ্য হয় ওরা, আপনি ওদেরকে নির্দেশ দিতে পারেন, সারাক্ষণ যেন শোভাযাত্রার ওপর ঝুলে থাকে।'

আর কিছু শোনার দরকার ছিল না, পেরট যা বলতে চায় এ-থেকেই তা বুঝে নিল কবীর চৌধুরী। কিন্তু পেরট ব্যাপারটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করে শোনার জন্যে কৌতূহল বোধ করল সে। বলল, 'তারপর?'

'প্রেসিডেনশিয়াল কোচের ওপর ঝুলে আছে এই রকম এক জোড়া হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামাবার নির্দেশ দেবে, এত বড় রামছাগল এমন কি সামরিক বাহিনীতেও নেই, চীফ। গুলি যদি করেই—বুম! সাথে সাথে না থাকবে প্রেসিডেন্ট, না থাকবে আরবী তেলের রাজা আর রাজপুত্র, না থাকবে চীফ অভ স্টাফ, আর না থাকবে মেয়র সিলভার।'

'তুমি বলতে চাইছ, গুলি খাওয়া হেলিকপ্টার প্রেসিডেনশিয়াল কোচের ওপর পড়ে বিধ্বস্ত হতে পারে?'

'পারে, চীফ,' মুচকি একটু হাসি দেখা গেল পেরটের ঠোঁটে। 'গুলি করার অর্ডারটা যদি কোন অ্যাডমিরাল দেন, তাঁকে আর পেনশন ভোগ করতে হবে না। অবশ্য কোর্ট-মার্শাল থেকে যদি প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হয় তবেই সে-প্রশ্ন উঠবে।'

'তোমার পরামর্শটা মন্দ নয়,' কবীর চৌধুরীর গলা শুনে বোঝা গেল, খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছে সে, পুরোপুরি নয়। 'তুমি ধরেই নিচ্ছ, এয়ার কমান্ডার তোমার মতই একজন সুস্থ চিন্তা-ভাবনার অধিকারী, ধরে নিচ্ছ তোমার লাইনেই ভাবনা-চিন্তা করবে সে। কিন্তু সে যে তোমার ঠিক উল্টোটা নয়, বুঝব কিভাবে? তবে, তোমার পরামর্শ গ্রহণ না করেও পারছি না, আর যখন কোন উপায় নেই। আমাদের স্লোগান কি, মনে আছে তো?'

'আছে, চীফ।' সুর করে গাইল পেরট, 'সামনে চলো, সামনে চলো, সামনে চলো রে!' এক সেকেন্ড থেমে আবার বলল সে, 'চীফ, আপনাদের বাংলা ভাষাটা কিন্তু দারুণ সুইট।'

'আমার একটা পরিকল্পনার কথা তোমাকে বলেছি কি?' পেরটের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কবীর চৌধুরী তার ঝাঁকড়া চুল নেড়ে বলে চলল, 'বাংলা ভাষাকে ভিত্তি হিসেবে রেখে, দুনিয়ার সমস্ত ভাষার সংমিশ্রণে এমন একটা বিশ্বজনীন ভাষা তৈরি করতে চাই আমি যে ভাষায় কথা বললে গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান প্রাণীরাও

তা বুঝতে পারবে...'

'গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান প্রাণী, চীফ?' পেরটের ধারণা হলো, শুনতে তার ভুল হয়েছে।

'হ্যাঁ, তারা আসবে!' কি এক আশ্চর্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর চেহারা। কোন সুদূরে তাকিয়ে আছে চোখ দুটো, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। 'তাদেরকে আমি আনব। আমার বিজ্ঞান সাধনা যদি মিথ্যে না হয়, তাদের অস্তিত্বও মিথ্যে নয়—হতে পারে না। আমি...'

একটা সঙ্কেত বেজে উঠল। সাথে সাথে বাস্তবে ফিরে এল পাগল বৈজ্ঞানিক। চোখ নামিয়ে মৃদু সুরে বলল, 'দুঃখিত, পেরট।' তারপর হাত বাড়াল বোতামের দিকে।

'এস-ওয়ান?'

'ইয়েস?'

'এস-থ্রী।' সরকারী গ্যারেজ থেকে চেস্টন কথা বলছে। 'লীড কোচ এই মাত্র বেরিয়ে গেল।'

'প্রেসিডেন্সিয়াল কোচ বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে জানাবে আমাকে।'

'ইয়েস, স্যার।'

পেরটের দিকে ফিরে চোখ-ইশারায় নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী। কোচ স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে এগোল পেরট। সামনে গ্যারেজের কোণ, বাঁক নিয়ে গ্যারেজের পাশে চলে যাচ্ছে কোচ।

আবার সঙ্কেত বেজে উঠল।

'এস-ফাইভ। যথাসময়ে। দশ মিনিট।'

'গুড। গ্যারেজে চলে এসো।'

আবার সঙ্কেত। রিপোর্ট করছে চেস্টন। 'স্যার, প্রেসিডেনশিয়াল কোচ গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে।'

'গুড।' আরেকটা বোতাম চাপ দিল কবীর চৌধুরী। 'রিয়্যার কোচ?'

'ইয়েস?' অপরিচিত গলা, এই প্রথম শুনছে কবীর চৌধুরী।

'মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করো। গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গেছি। রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ভাবে আটকা পড়ে গেছে একটা ক্রেন। কিছু না, স্রেফ একটা দুর্ঘটনা। তবু ঝুঁকি নেয়া চলবে না। তাই বলে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। সীট ছেড়ে কাউকে উঠতে হবে না। মিনিট কয়েকের জন্যে গ্যারেজে ফিরে আসছি আমরা, কর্তৃপক্ষ নতুন একটা রুট ঠিক করলেই আবার বেরুব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

ধীরেসুস্থে আরেকটা বাঁক ঘুরে সরকারী গ্যারেজের সামনের দিকে চলে এল কবীর চৌধুরীর কোচ। গ্যারেজের দরজা ঘেঁষে এগোল সেটা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্যারেজের ভেতর আগের জায়গাতেই রয়েছে রিয়্যার কোচ, তার আরোহীরা কবীর চৌধুরীর কোচের চার ভাগের সামনের তিন ভাগই দেখতে পাচ্ছে। সামনের সীটগুলোর উল্টো দিকের দরজা দিয়ে পেরটকে নিয়ে নামল কবীর

চৌধুরী, হাবভাবে কোন রকম অস্থিরতা নেই। গ্যারেজে ঢুকল হাসি মুখে। গ্যারেজের ভেতর থেকে নিগ্রো চার্লিকে দেখতে পেল না কেউ, কারণ কবীর চৌধুরীর কোচ থেকে পিছনের দরজা দিয়ে নিচে নামল সে। নেমেই কাজে লেগে গেল। পুরানো নাম্বার প্লেটের গায়ে নতুন প্লেটটা ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকাতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার।

গ্যারেজের অনেকটা পিছনে রয়েছে রিয়্যার কোচ, আরোহীরা কৌতূহলের সাথে সাদা কোট পরা দু'জন লোককে এগিয়ে আসতে দেখল। এমন কিছু ঘটেনি যাতে তাদের কারও মনে সন্দেহের ছায়া পড়তে পারে। গ্যারেজ থেকে রিয়্যার কোচ বেরিয়ে যেতে দেরি করছে বটে, কিন্তু জীবনের কোন্ কাজটাই বা ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘটে! এই দেরির সাথে অল্পবিস্তর সবাই তারা অভ্যস্ত। ড্রাইভারের পাশের দরজার সামনে পৌছে দাঁড়িয়ে পড়ল কবীর চৌধুরী, মিটি মিটি হাসিটা এখনও লেগে আছে মুখে। অলস ভঙ্গিতে তাকে ছাড়িয়ে গেল পেরট, যেন কোন কাজ নেই তাই কোচের পিছন দিকটায় ঘুরে আসতে যাচ্ছে। রিয়্যার কোচের আরোহীদের মধ্যে খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক নিশ্চয়ই আছে, তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার জন্যে গ্যারেজের সামনে রয়েছে চেস্টন আর জ্যাক। অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখাচ্ছে তারা, কিন্তু কিচ্ছু করছে না।

সামনের বাঁ-হাতি দরজা খুলে দুটো ধাপ ওপরে উঠল কবীর চৌধুরী। ড্রাইভারকে বলল, 'কিছু করার নেই। এই রকম ঘটেই থাকে। নতুন একটা রুট ঠিক করছে ওরা, সেটা ধরেই নব হিলে যাব আমরা।'

একটু অবাক দেখাল ড্রাইভারকে, তার বেশি কিছু না। জানতে চাইল, 'হ্যারি কোথায়?'

'হ্যারি?'

'লীড কোচের ড্রাইভার।'

'ও! ওর নাম তাহলে হ্যারি।' কাঁধ ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী। 'অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কি আর করা!'

'অসুস্থ?' সন্দেহ ডালপালা মেলতে শুরু করল। 'এই তো মাত্র দু'মিনিট আগে...' মৃদু দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়ে ঝট করে পিছন দিকে তাকাল ড্রাইভার। বিস্ফোরণের ক্ষীণ শব্দের সাথে সাথেই শোনা গেল কাঁচ ভাঙার এবং চাপে পড়ে বাতাস বেরিয়ে যাবার হিস্‌স্ আওয়াজ। কোচের পিছন দিকটা এরই মধ্যে ঘন গাঢ় ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে। ড্রাইভার বিস্ফারিত চোখে দেখল, ভৌতিক চেহারার এক টুকরো মেঘ কিভাবে যেন ঢুকে পড়েছে কোচের ভেতর। কোচের পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে পেরট, দরজাটা যাতে বন্ধই থাকে সেজন্য সেটার গায়ে হেলান দিয়ে আছে সে। ঘন ধোঁয়ার জন্যে তাকে দেখতে পেল না ড্রাইভার। কোচের প্রতিটি আরোহী, অন্তত যাদেরকে এখনও দেখা যাচ্ছে, সীটের ওপর একটু ঘুরে বসে যার যার পকেটে হাত ভরে আগ্নেয়াস্ত্র বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু এমন কাউকে দেখছে না তারা যাকে গুলি করা যায়।

বিস্ময়ের আঘাত কাটিয়ে উঠতে সময় নিচ্ছে ড্রাইভার। আরো দুটো বিস্ফোরণের শব্দ হলো। দম বন্ধ করে নিয়ে গ্রেনেড আকৃতির দুটো গ্যাস বোমা

ছুঁড়ল কবীর চৌধুরী—একটা ড্রাইভারের পায়ের কাছে, অপরটা দু'সারি সীটের মাঝখানের প্যাসেজে। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সিঁড়ির ধাপ থেকে কোচের মেঝেতে উঠে দাঁড়াল সে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা, হাতলটা চেপে ধরে হেলান দিল কবাটের গায়ে। যদিও এই অতিরিক্ত সাবধানতার কোন দরকার ছিল না, কারণ এই গ্যাস নাকে একবার ঢুকলে সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যায় মানুষ। দশ সেকেন্ড কাটল। দরজা খুলে কোচ থেকে নেমে পড়ল কবীর চৌধুরী। কোচের সামনে চলে এসে দম ছাড়ল সে। তার এক সেকেন্ড আগেই ওখানে পৌঁচেছে পেরুট। চেসটন তার সঙ্গীকে নিয়ে ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে গ্যারেজের মেইন গেট। এই মুহূর্তে পরনের ওভারঅল খুলছে তারা, ওভারঅলের নিচে থেকে বেরিয়ে আসছে নিখুঁত ফিট করা দামী স্যুট।

'হয়ে গেল? এত তাড়াতাড়ি?' পেরুট আর কবীর চৌধুরীর দিকে সবিস্ময়ে ঘন ঘন তাকাল চেসটন। 'আমার স্যার, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে!'

সকৌতুকে হাসল কবীর চৌধুরী।

'কিন্তু,' হঠাৎ দারুণ চিন্তিত দেখাল চেসটনকে, 'স্যার, নাকে ওই গ্যাসের একটু ছোঁয়া লাগলেই যদি একজন লোক জ্ঞান হারায়, তাহলে ফুসফুস ভরে গেলে কি অবস্থা হবে? ওরা তাহলে তো একজনও বাঁচবে না!'

পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে তালা দিল দরজায়। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে একবার পেরুট আর একবার কবীর চৌধুরীর দিকে তাকাচ্ছে চেসটন। মিটি মিটি হাসি নিয়ে তার অস্বস্তিটুকু উপভোগ করছিল কবীর চৌধুরী। তারপর বলল, 'অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসার পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে নিউট্রাল হয়ে যাবে গ্যাস। এখন তুমি যদি ওই কোচে ওঠো, তোমার কিছুই হবে না। তবে ওখানে যারা রয়েছে, এক ঘন্টার আগে তাদের কারও জ্ঞান ফিরবে না।'

গ্যারেজের সামনে চলে এসেছে ওরা, এই সময় একটা ট্যাক্সি থেকে নামল জন কনওয়ে। কোচে চড়ল সবাই, মোটর শোভাযাত্রায় এটাই এখন রিয়্যার কোচ হবে। স্টার্ট দিয়ে কোচ ছাড়ল পেরুট। নব হিলের দিকে চলল ওরা।

কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। 'এস-টু?'

'জ্বী, স্যার।'

'খবর কি?'

'শান্ত। বড় বেশি শান্ত, স্যার। আমার ভাল ঠেকছে না।'

'কি ঘটছে বলে মনে করো?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার। যদি আন্দাজ করতে বলেন...'

'করো।'

'একজন অফিসার টেলিফোন করে আমাদের ওপর গাইডেড মিসাইল ছোঁড়ার নির্দেশ চাইছে, স্যার।'

'কার কাছ থেকে নির্দেশ চাইছে?'

'দেশের হাইয়েস্ট মিলিটারি অথরিটির কাছ থেকে, স্যার।'

'তার মানে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে। যোগাযোগ হতে একটু সময় লাগবে, কি বলো?'

'ভুল হলে মাফ করবেন, স্যার,' বলল ওয়াল্টার। 'আমার ধারণা দেশের হাইয়েস্ট মিলিটারি অথরিটি এই মুহূর্তে নব হিলে রয়েছেন।'

'ওহ, গড!' বিড়বিড় করে উঠল কবীর চৌধুরী। ভাবল, তাই তো! জেনারেল পীল, চীফ অভ স্টাফ, এবং প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা, হোটেল হপকিন্সে প্রেসিডেন্টের পাশের কামরাতেই রয়েছেন। মোটর শোভাযাত্রায় তাঁরও অংশগ্রহণ করার কথা। 'তার সাথে যোগাযোগ করা হলে কি ঘটবে বলে মনে করো তুমি?' মনে মনে উদ্বেগ বোধ করলেও কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে তার কোন প্রকাশ ঘটল না।

'শোভাযাত্রা বাতিল ঘোষণা করা হবে, স্যার।' ওয়াল্টার জানে, প্রেসিডেন্ট চীফ অভ দি আর্মড ফোর্সেস হলেও সিকিউরিটি সংক্রান্ত ব্যাপারে চীফ অভ স্টাফ জেনারেল পীলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে। 'এক মিনিট, স্যার।' কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর আবার কথা বলল সে, 'গেটের একজন গার্ড এই মাত্র টেলিফোন ধরল, স্যার। ব্যাপারটা অনেক কিছু হতে পারে, আবার কিছু নাও হতে পারে।'

ঘাড়ে আর গলায় চিটচিটে ঘাম অনুভব করল কবীর চৌধুরী। এই অপারেশনের প্রস্তুতি পর্বের জন্যে আড়াই মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করতে হয়েছে তাকে। এখন যদি শোভাযাত্রা বাতিল করা হয়, টাকাটা পানিতে পড়বে। কন্ট্রোল যদি হেলিকপ্টার দুটোকে টেক-অফ করার অনুমতি না দেয়, বুঝতে হবে কর্তৃপক্ষ বিপদ টের পেয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে শোভাযাত্রা অবশ্যই বাতিল করা হবে।

এটা সেটা নানা দুশ্চিন্তা ভিড় করে এল কবীর চৌধুরীর মনে। এক রাষ্ট্রের কাছে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরানো দেনা আছে তার। তাদের কাছ থেকেই আরও আড়াই মিলিয়ন কর্জ করেছে। এই অপারেশন সফল হলে মোটা একটা টাকা পাবে বলে আশা করছে সে। দেনা শোধ করেও হাতে প্রচুর থাকবে, যা দিয়ে অন্তত তিনটি বছর অন্য কোন দিকে খেয়াল না দিয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এই অপারেশন যদি সফল না হয়...পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল সে।

'এস-ওয়ান?'

'ইয়েস?' কবীর চৌধুরী অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করল তার দু'পাটি দাঁত পরস্পরের সাথে শক্তভাবে জোড়া লেগে আছে।

'স্যার, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না!' চাপা উত্তেজনার সাথে বলল ওয়াল্টার। 'টাওয়ার আমাদেরকে এইমাত্র টেক-অফের অনুমতি দিল।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল কবীর চৌধুরী, এই সময় কে যেন তার কাঁধ থেকে সরিয়ে নিল হিমালয় পাহাড়টা। তারপর শান্ত সুরে বলল, 'কথায় বলে, উপহার পাওয়া ঘোড়ার মুখের ভেতরটা দেখতে নেই। তোমার কি ধারণা, অনুমতিটা কেন পেলে?'

'গার্ডরা নিশ্চয়ই টাওয়ারকে জানিয়েছে যে ওরা আমাদের কাগজপত্র চেক করে দেখেছে—ঠিক আছে সব।'

'দেরি কোরো না, স্টার্ট দাও। রোটরের আওয়াজ হলে তোমার গলা পাওয়া

যায় কিনা শুনতে চাই।'

সিকিউরিটির লোকেরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুটো লাইন তৈরি করেছে, দু'লাইনের মাঝখানে ছয় ফিট চওড়া একটা গলি, এক লাইনের লোক আরেক লাইনের লোকের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে গলিটা হোটেল থেকে শুরু হয়ে প্রেসিডেনশিয়াল কোচ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে, অতি সামান্য একটু দূরত্ব। রাস্তা থেকে পথিক এবং যানবাহন সব একশো গজ সরিয়ে দিয়ে একটা ব্যারিকেডও রাখা হয়েছে। তাছাড়াও চারদিকে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা। এতে করে আরব দেশের রাজা আর পারস্য উপ-সাগরের প্রিন্স অস্বস্তি বোধ করছেন, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তাদের নিজেদের দেশে—যেখানে প্রাণহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, এবং বহুকাল চর্চার ফলে হত্যাকারীরা শৈল্পিক নৈপুণ্য দেখাতে পারঙ্গম—এই দৃশ্য দৈনন্দিন জীবনেরই একটা অংশ। বরং সিকিউরিটির এই আয়োজন না থাকলেই তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতেন। তাছাড়া, এই ব্যাপক আয়োজনের অভাব ঘটলে তাঁরা এই ভেবে কাতর হতেন যে মেহমান হিসেবে তাঁদেরকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে না। বলাই বাহুল্য, সেক্ষেত্রে তেল আলোচনা ব্যর্থ হবার সমূহ আশঙ্কা থাকত।

সবার আগে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। ক্ষীণ একটু বিষণ্ন হাসি লেগে আছে তাঁর ঠোঁটে, এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু যেন উদাস হয়ে উঠলেন, সম্ভবত হাত নাড়ার জন্যে কেউ নেই লক্ষ করে। দীর্ঘদেহী, একটু মোটাসোটাই বলা যায়, ধূসর রঙের গ্যাবার্ডিন স্যুটে চমৎকার মানিয়েছে। তাঁর অভিজাত চেহারা ভোগ-বিলাসী রোমান সম্রাটের কথা মনে করিয়ে দেয়। মাথায় রুপোলি চুল, লোকে বলাবলি করে এইটেই তাঁর সবচেয়ে গর্বের এবং আনন্দের বস্তু। ওভাল অফিসে তাঁর থাকার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু তাঁকে ছাড়া ওই অফিসে আর কাউকে পাঠাবার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারে না ভোটাররা—ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনিক দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ইত্যাদি দেখিয়ে তাদের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন মাল্টি-মিলিওনিয়ার। মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন, মানুষ তাঁকে পছন্দ করছে, সর্বত্রই তাঁর প্রশংসা—গত পঞ্চাশ বছরে আর কোন প্রেসিডেন্টের কপালে এতটা জোটেনি। বরাবরের মত আজও তাঁর হাতে সরু একটা ছড়ি রয়েছে। এই ছড়ির ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে। বছর কয়েক আগে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে সামান্য একটু চোট পেয়েছিলেন তিনি, তখন দু'দিনের জন্যে তাঁকে একটা ছড়ি ব্যবহার করতে হয়। পায়ের ব্যথা সেরে গেল, কিন্তু হাতের ছড়ি তাঁর হাতেই রয়ে গেল, সেটাকে তিনি হারিয়ে যেতে দিলেন না। তাঁর যে ছড়ির কোন দরকার করে না, সবাই তা জানে। তিনি রুজভেল্টের ভক্ত, হতে পারে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার ইচ্ছে থেকে ছড়ির প্রতি এই আসক্তি। কারণ যাই হোক, সেই থেকে এই ছড়ি ছাড়া তাঁকে কেউ দেখেনি।

কোচের পাশে পৌঁছলেন তিনি, খানিকটা ঘুরলেন, মৃদু হেসে সামান্য বাউ করে মেহমানদের প্রথমজনকে কোচে ওঠার আমন্ত্রণ জানালেন।

সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আর সম্মান একমাত্র তাঁরই তো পাবার অধিকার।

দুনিয়ার সব তেল এক করলে যতটুকু হবে, তাঁর একার তেল তারচেয়ে কম নয়। দীর্ঘদেহী, কিন্তু রোগা নন, অথচ শরীরে এক ছটাক মেদ নেই। পরনে চোখ ধাঁধানো সাদা আলখাল্লা, নিচের অংশ কংক্রিটের মেঝেতে লুটাচ্ছে। মাথার চারদিক ঘিরে রয়েছে একটা আচ্ছাদন, সেটাও সাদা এবং চোখ-ধাঁধানো। তীক্ষ্ণ, ধারাল, একটু লম্বাটে চেহারা, সুন্দর করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। চোখ জোড়ায় ঈগল পাখির দৃষ্টি, ঘন ভুরু দুটো চোখের ওপর কার্নিসওয়ালা টুপি। ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বলে মনে করা হয় তাঁকে, ইচ্ছে করলেই তিনি হতে পারতেন স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী শাসক, কিন্তু দুটোর কোনটাই হননি। তাঁর বিরুদ্ধে সত্যি মিথ্যে অনেক অভিযোগ আছে, কিন্তু প্রজারা তাঁর প্রশংসাও করে। কারও আইন মানার দরকার হয় না তাঁর, তিনি শুধু নিজের তৈরি আইন মেনে চলেন।

এরপর এলেন প্রিন্স। তাঁর ছোট্ট শেখ-রাজ্য এতই ছোট যে সেখানে রাজা উপাধি পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না কেউ। আরব বাদশা জমির যা খাজনাপাতি পান তাঁর পাঁচ ভাগের এক ভাগও প্রিন্স পান না, অথচ তাঁর প্রভাবও রাজার মতই বিরাট। তাঁর দেশটা ছোট, অনুর্বর বালি ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই গোটা দেশ তেল-সাগরের ওপর ভাসছে। মিশুক, খোশ-মেজাজী ব্যক্তিত্ব। বিশ্বাসযোগ্য মহল থেকে বলা হয়, তাঁর গাড়িতে সামান্যতম যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলেও, সেই মুহূর্তে অচল জ্ঞানে বাতিল করা হয় সেটা, আর কখনও ব্যবহার করা হয় না—জেনারেল মোটরের জন্যে এটা একটা খুশির খবর সন্দেহ নেই। তিনি একজন দক্ষ পাইলট, নিপুণ রেস-কার ড্রাইভার, পৃথিবীর সেরা কয়েকটা নাইটক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। ইন্টারন্যাশনাল প্লেবয় হিসেবে খ্যাতি পাবার জন্যে চাল-চলনে প্রায়ই তাঁকে বেহিসেবী হতে হয়েছে, তাতে অবশ্য কাউকে প্রতারিত, আহত বা কলঙ্কিত হতে হয়নি। ভোগ-বিলাসের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকলেও তাঁর খুলির ভেতর রয়েছে কমপিউটর ব্রেন, যেটা তাঁকে ঝানু ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। মাঝারি গঠনের মানুষ, ভাল স্বাস্থ্য, মৃত্যুর সময়ও তাঁর পরনে ঐতিহ্যবাহী আরব পোশাক থাকবে না। স্যাভিল রো-র ভাল খদ্দেরদের একজন তিনি। তাঁর জুতো কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি করে হঙকঙের চীনারা। সরু গোঁফ আছে, এতই সরু যে কয়েক হাত দূর থেকে সেটা চোখেই পড়ে না।

তাঁদের পিছু পিছু এল সাদ ফাহিম আর শেখ খায়ের, প্রথমজন বাদশার আর দ্বিতীয়জন প্রিন্সের তেল-মন্ত্রী। এরা দু'জনেই পশ্চিমা কাপড় পরে আছেন। দু'জনেরই মেদবহুল শরীর, নড়তে চড়তে বারোমাস। সাদ ফাহিমের রয়েছে ছাগলদাড়ি, শেখ খায়েরের দাড়ি-গোঁফ কামানো।

এরপর কোচে উঠলেন জেনারেল পীল। সামরিক পোশাক নয়, পরে আছেন হালকা নীল ডোরা কাটা কাপড়ের স্যুট, তবু তাঁকে একজন জাঁদরেল জেনারেল বলে চিনতে ভুল হয় না। কোমরে শুধু যদি একটা তোয়ালে জড়ানো থাকে, তাহলেও তাঁকে একজন মারমুখো যোদ্ধা বলে চেনা যাবে। ছয় ফিটের ওপর লম্বা, সারা শরীরে পাকানো রশির মত পেশী, ষাট বছর বয়সেও হাঁটা-চলার মধ্যে আশ্চর্য শক্তি আর প্রাণ-চাঞ্চল্যের বিচ্ছুরণ লক্ষ করার মত। নীল চোখ জোড়া ছায়া পড়া

লেকের পানি যেন, শান্ত আর ঠাণ্ডা। একটা কথা দু'বার কখনও জিজ্ঞেস করেন না। এমনকি তাঁর খয়েরী রঙের চুলে চকচকে ভাবটুকু পর্যন্ত এখনও অম্লান। জেনারেল পীল তেল বা তেলের বাজার দর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নন, আলোচনায় তিনি দর কষাকষি করতে পারবেন বলে সাথে আছেন ব্যাপারটা তাও নয়। যুদ্ধজাহাজ, ট্যাংক আর প্লেনের জন্যে তেল তাঁর দরকার—এবং দরকার মত চাইলেই পান, কে কোত্থেকে যোগাড় করবে সেটা তাঁর মাথাব্যথা নয়। তাঁর উপস্থিতির অন্যতম কারণ হলো, সামান্য একটা রাস্তা পেরোতে হলেও প্রেসিডেন্টের তাঁকে দরকার হয়। প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্যে বলেও থাকেন, জেনারেল পীলের অ্যাডভাইসের ওপর ভীষণ ভাবে নির্ভর করেন তিনি। জেনারেলের রয়েছে দিগন্তবিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং নিরেট কমনসেন্স, ওয়াশিংটনের হাই-অফিশিয়ালরা তাঁকে ঈর্ষা করলেও এই দুই গুণের জন্যে তাঁর পদোন্নতি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। ওয়াশিংটনে যারা ঠাণ্ডা মাথার বিবেচক তারা সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে তাঁর সম্পর্কে বলেছে, প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে জেনারেল পীলের কোন বিকল্প হতে পারে না। এই অতিরিক্ত দায়িত্ব কাঁধে চাপায় সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীকে পরিচালনা করার জন্যে যথেষ্ট সময় তাঁর হাতে থাকে না বটে, কিন্তু দুটো দায়িত্বই তিনি সমান দক্ষতার সাথে পালন করে চলেছেন। কেউ তাঁকে কখনও ক্লান্ত বা বিরক্ত হতে দেখেনি। তিনি একজন স্বনামধন্য রাজনীতিক বা স্টেটসম্যান হতে পারতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মসূত্রে তিনটে অভিশাপ আছে তাঁর জীবনে—এক, মিথ্যে কথা বলতে পারেন না, দুই, অসৎ হতে পারেন না, তিন, অটল নৈতিকতা বোধ।

এরপর কোচে উঠলেন স্টিফেন বেকার, প্রেসিডেন্টের এনার্জি জার। এই পদে সদ্য বরণ করা হয়েছে তাঁকে, এখনও তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা হয়নি। এই পদের জন্যে যে কোয়ালিফিকেশন দরকার ছিল তা তাঁর আছে, বরং বেশিই আছে, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার পরিমাণ নেহাতই কম। এনার্জি বা শক্তি একটা জিনিস, যা তাঁর অঢেল আছে। অত্যন্ত ছটফটে আর নার্ভাস টাইপের মানুষ, হাত আর চোখ মুহূর্তের জন্যেও শান্ত থাকে না। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, দশ লাখে একটা ব্রেন। মরু তেল মালিকদের সাথে এই তাঁর প্রথম মুখোমুখি হওয়া। তিনি যে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামী বলে ধরে নিয়েছেন নিজেকে, সেটা তাঁর হাবভাব দেখে বেশ বোঝা যায়।

এরপর কোচে উঠলেন জেমস ফেয়ার। অস্বাভাবিক মোটা, মাথার পিছন দিকটা ছাড়া বাকি সবটুকুই টাক। তাঁর থুতনি আর গলায় কখনও তিনটে, কখনও পাঁচটা ভাঁজ পড়ে—নির্ভর করে কোন্দিকে ঘাড় ফিরিয়ে থাকেন তার ওপর। সাধারণত মোটা মানুষদের চেহারায় যা দেখা যায় না, বিষণ্ণ একটা ভাব আছে তাঁর চেহারায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ব্যর্থ কৃষক, নিজের ফার্মে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে উৎসাহী নন, তাঁর লক্ষ্য মান ভাল করা। অনেকেই বিশ্বাস করতে রাজি হবেন না, কিন্তু আসলে আন্ডার সেক্রেটারি অভ স্টেট জেমস ফেয়ার মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তেলপতিদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের আলোচনায় প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করবেন তিনি।

সবশেষে এগিয়ে এলেন মাইক সিলভার। প্রেসিডেন্ট তাঁর পিঠে হাত রেখে সামনের দিকে একটু ঠেলে দিলেন, কিন্তু এক পা পিছিয়ে এসে হাত-ইশারায় প্রেসিডেন্টকে এগিয়ে যাবার অনুরোধ জানালেন সিলভার। মৃদু হেসে অনুরোধ রাখলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে অনুসরণ করে ধাপ বেয়ে কোচে উঠলেন সিলভার। ভদ্রলোকের চেহারাই বলে দেয়, তাঁর পূর্ব-পুরুষরা ইতালীয় ছিলেন। পেটমোটা বলতে বা বোঝায় ইনি তাই, কিন্তু যথেষ্ট শক্তি রাখেন শরীরে। এনার্জি সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ আছে, কিন্তু তাতে তাঁর রাতের ঘুম হারাম করার দরকার হয় না। তিনি সাথে আছেন—একটা কারণ, যাত্রীদের একজন গাইড দরকার। আরেকটা কারণ, প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারী ভাবে প্রেসিডেন্টই মেহমানদের হোস্ট বটেন, কিন্তু এই এলাকাটা মাইক সিলভারের, তিনি একাধারে হোস্ট এবং অতিথি। কারণ তিনিই সান ফ্রান্সিসকোর মেয়র।

রিয়্যার কোচ থেকে, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে দেখল কবীর চৌধুরী। একটা বোতামে চাপ দিল সে। 'এস-টু?'

ওয়াল্টার সাড়া দিল, 'ইয়েস।'

'আমরা রওনা হলাম।'

'যাত্রা শুভ হোক, স্যার।'

মোটর শোভাযাত্রা শুরু হলো। সামনে রয়েছে একটা পুলিস কার, আর মোটরসাইকেল আউটরাইডাররা। তারপর লীড কোচ, প্রেসিডেনশিয়াল কোচ এবং রিয়্যার কোচ। অবশেষে আরও একটা পুলিস কার এবং দু'জন মোটরসাইকেল আউটরাইডার। এই মোটর শোভাযাত্রার সাথে মেহমানদের শহর দেখানোর কোন সম্পর্ক নেই, তা দেখানো হয়েছে কাল বিকেলে এয়ারফোর্স ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পরপরই। আজকের এটা নিতান্তই বিজনেস ট্রিপ। ক্যালিফোর্নিয়া বরাবর এগোবে। শোভাযাত্রা, ভ্যান নেস, লম্বার্ড, রিচার্ডসন এভিনিউ হয়ে পৌঁছুবে প্রেসিডিয়ো-তে। যাত্রা শুরুর বিন্দু থেকে সামনের সবটুকু রাস্তায় আজ সকালের জন্যে সাধারণ যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ভায়াডাক্ট অ্যাপ্রোচ ধরে এগোল শোভাযাত্রা। বাঁক নিল ডান এবং উত্তর দিকে। আর তারপরই নাক বরাবর দেখা গেল গোল্ডেন গেট ব্রিজ—দূর থেকে মনে হলো, ওদের সামনে শূন্যে ঝুলে আছে যেন।

তিন

প্রকৌশল জগতে গোল্ডেন গেট ব্রিজ একটা বিস্ময়। সান ফ্রান্সিসকোর লোকেরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে, প্রকৌশলগত দক্ষতা আর নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে এটা

এই জগতের একমাত্র বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। সবাই জানে, এটা তৈরি হবার পরপরই পৃথিবীর সেরা, সুন্দরতম ব্রিজ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ইঁট রঙা বিশাল দুটো টাওয়ার রয়েছে, ঘন কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এসে উঠে গেছে আকাশের দিকে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভেসে আসে এই কুয়াশা, প্রায় সময়ই ব্রিজের ওপরের অংশটাকে বাদ রেখে ঢেকে ফেলে নিচের সবটুকু—তখন মনে হয় গোটা ব্রিজ শূন্যে ভাসছে। আর যখন কুয়াশা সম্পূর্ণ সরে যায়, স্তম্ভিত বিস্ময়ে দর্শকরা উপলব্ধি করে যে জাঁকজমকের সাথে এই রকম একটা বিশাল মেকানিক্যাল মহাকাব্যের কথা মানুষ শুধু যে কল্পনা করার স্পর্ধা রাখে তাই নয়, সেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার কারিগরী জ্ঞান এবং দক্ষতাও তার আছে। এমন কি চোখ যখন সাক্ষ্য দেয় যে, হ্যাঁ, ওটা ওখানে আছে, তখনও নির্দ্বিধায় মেনে নিতে ইতস্তত করে মন।

গোল্ডেন গেট ব্রিজ সৃষ্টির কৃতিত্ব এককভাবে মাত্র একজন মানুষের ওপর বর্তায়। ভদ্রলোকের নাম যোশেফ. বি. স্ট্রস। ভদ্রলোক যে জেদি ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কাজে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা টপকাতে হয় তাঁকে। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাও কম ছিল না। তাঁর আর্কিটেক্ট বন্ধুরাও তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে। তারা বলেছিল, তোমার এই স্বপ্ন টেকনিক্যাল দিক থেকে অসম্ভব। কারও কথায় কান দেননি যোশেফ। কাজে নেমে পড়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি এই গোল্ডেন গেট ব্রিজ। উদ্বোধন করা হয় উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে।

উনিশশো চৌষট্টি সালে ভ্যারাজ্জানো-ন্যারোজ ব্রিজ তৈরির আগে পর্যন্ত এটাই ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে লম্বা সিঙ্গেল-স্প্যান সাসপেনশন ব্রিজ। আজও সবচেয়ে লম্বা ব্রিজের চেয়ে গোল্ডেন গেট মাত্র বিশ গজ ছোট।

গোল্ডেন গেট নদীর গা থেকে অস্বাভাবিক চওড়া টাওয়ার দুটো ওপর দিকে সাড়ে সাতশো ফিট উঠে গেছে, লম্বায় ব্রিজটা পৌনে দু'মাইল। বানাতে তখন খরচ পড়েছিল সাড়ে তিন কোটি ডলার। এখন তৈরি করতে খরচ লাগবে চব্বিশ কোটি ডলার বা তারও বেশি।

এক শ্রেণীর আমেরিকানদের খুব উপকারে লাগছে গোল্ডেন গেট ব্রিজ। জীবনের বোঝা যাদের কাছে অসহ্য বলে মনে হয়, যারা এই বোঝা ফেলে পালাতে চায়, তাদের কাছে এই ব্রিজ বিদায় নেয়ার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। কম করেও পাঁচশো আত্মহত্যার কথা জানা গেছে, ধরা যায় আরও পাঁচশোর কথা জানা যায়নি। রেকর্ড রয়েছে, এদের মধ্যে বেঁচে গেছে মাত্র আটজন। অনেকের লাশ পাওয়া যায়নি, কিন্তু তার মানে তারা বেঁচে গেছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ব্রিজ থেকে পানির গা দুশো ফিট নিচে, পানির সাথে শরীরের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হওয়ার পরও কেউ যদি বেঁচে যায়, গোল্ডেন গেটের দানব আকৃতি ঢেউ আর তীব্রগতি স্রোত তার বিদায় নেয়ার ইচ্ছেটাকে খুব দ্রুততার সাথে পূরণ করে দেবে। এই ঢেউ আর স্রোতের কারণে, ব্রিজের দু'ধারেই, বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত, সারাক্ষণ কাঁপছে।

দৈত্যাকার প্রথম টাওয়ারের নিচ দিয়ে এগোল মোটর শোভাযাত্রা। বিলাসবহুল

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে হাস্য-রসিকতায় ছেদ পড়ল হঠাৎ করেই। গোল্ডেন গেট ব্রিজে উঠলে সবারই এই দশা হয়, মুখে কথা ফোটে না। বাদশার চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটল, ব্রিজটাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন তিনি। তাঁর রাজ্যে এ-ধরনের ব্রিজ নেই, কিন্তু সেটা তাঁর মনোবেদনার কারণ হলো না। তিনি দুঃখ পেলেন এই ভেবে যে এর চেয়ে বড় একটা ব্রিজ তৈরি করে সবাইকে তাক লাগাবার জন্যে যত বড় নদী দরকার, অত বড় নদীই তাঁর রাজ্যে নেই।

জুনের চমৎকার একটা সকাল। গোটা বে এলাকা ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর একটা ছবি যেন। ওদের সামনে গোল্ডেন গেট বরাবর উজ্জ্বল সবুজ আর হলুদ রঙা খেত-খামার, উর্বর আদিগন্ত জমিতে ফসলের আবাদ। ওদের ডান দিকে সূর্য, এরই মধ্যে নির্মেঘ আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। নিচে গোল্ডেন গেটের নীল-সবুজ পানি, ঝলমল করছে রোদ পড়ে।

গোল্ডেন গেট ব্রিজ দেখে প্রিন্সের অনুভূতি হলো সম্পূর্ণ অন্য রকম। তিনি তাঁর নিজের যুগের মানুষ, কিছু দেখে বিস্মিত হলে সেটা প্রকাশ করতে দ্বিধায় ভোগেন না। বললেন, 'আমি মুগ্ধ। আমেরিকা এই ব্রিজ নিয়ে গর্ব করতে পারে। যদি কখনও সুযোগ হয়, এর ওপর কিছুক্ষণ হাঁটব আমি।' কথাটা বলার সময় তিনি জানলেন না, একটু পরই সুযোগটা পেতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু সুযোগ পেলেও হাঁটাহাঁটি করার ইচ্ছে তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না।

বাদশা এবং প্রিন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'টেকনিক্যাল নো-হাউ দিয়ে সাহায্য করতে রাজি আছে আমেরিকা, কিন্তু আপনাদের নদী কোথায়, যে ব্রিজটা তৈরি হবে?'

'আপনি বলতে চাইছেন, মি. প্রেসিডেন্ট,' মুচকি হেসে প্রশ্ন করল প্রিন্স, 'আগে আমরা একটা কৃত্রিম লেক তৈরি করি, তাহলে ব্রিজ তৈরির প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ হবে আপনার, তাই না?'

বাদশার চেহারা থেকে গাম্ভীর্যের ছায়া একটু সরে গিয়ে আগ্রহের ভাব ফুটে উঠল, তিনি বললেন, 'আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ নয়!'

নিজের চারদিকে, কোচের ভেতর, আরও একবার চোখ বুলিয়ে প্রিন্স বললেন, 'আপনার স্টাইল আমার খুব পছন্দ, মি. প্রেসিডেন্ট। কিভাবে বেড়াতে হয়, আপনি জানেন। এই রকম একটা কোচ সম্ভব, আমাকে কেউ বলেনি। আমার একটা থাকলে মন্দ হত না।'

'এই মুহূর্তে আরেকটা কোচ তৈরির নির্দেশ দিলাম আমি,' সহাস্যে বললেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর মুখের কথাই হুকুম, সাত তাড়াতাড়ি জায়গামত পৌঁছে যাবে। 'কোচটা আপনাকে উপহার দিতে পেরে আমার দেশ সম্মানিত বোধ করবে। ওতে আরাম আয়েশ আর সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা অবশ্যই আপনার নিজের স্পেসিফিকেশন অনুসারে হবে।'

শুকনো গলায় বাদশা বললেন, 'প্রিন্স তার যে-কোন ভেহিকেলের অর্ডার এক ডজনের কম দেন না। আপনি যদি তাঁকে একটা উপহার দেন, আরও অন্তত এক জোড়া তিনি কিনে নেবেন।' হাত তুলে আকাশের দিকে প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। মাথার ওপর দুটো ন্যাভাল হেলিকপ্টার রয়েছে। 'ধন্যবাদ, মি.

প্রেসিডেন্ট। আপনি আমাদের নিরাপত্তার দিকটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখছেন।'

প্রেসিডেন্ট হাসলেন, কিন্তু তাঁর হাসিতে কোন মন্তব্য পাওয়া গেল না। যা দিবালোকের মত সত্য, সে-ব্যাপারে মন্তব্য করার সুযোগ কোথায়?

জেনারেল পীল বললেন, 'সিকিউরিটির ব্যবস্থা যেটুকু চোখে পড়ছে, স্রেফ লোক দেখানো, ইওর হাইনেস।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে চীফ অভ স্টাফের দিকে তাকালেন বাদশা, মুখ খোলার প্রয়োজন বোধ করলেন না। কাজেই ব্যাপারটা জেনারেল পীলকে ব্যাখ্যা করতে হলো।

'ব্রিজের ওপারে আমাদের সিকিউরিটি অফিসার আর মাঝে মধ্যে দু'একটা পুলিস কার ছাড়া এখান থেকে সান রাফায়েল পর্যন্ত কিছুই আপনার চোখে পড়বে না, ইওর হাইনেস। অথচ সিকিউরিটির কড়া ব্যবস্থা ঠিকই করা হয়েছে। এখান থেকে সান রাফায়েলের মাঝখানে প্রতি গজের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে এফ. বি. আই.। তারা সবাই সশস্ত্র। স্নাইপার সবখানে আছে, এমনকি আমেরিকাতেও।'

'বিশেষ করে আমেরিকাতে,' প্রেসিডেন্ট গম্ভীর মুখে বললেন।

চেহারায় কৃত্রিম সিরিয়াস ভাব ফুটিয়ে তুলে বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজেই আমরা নিরাপদ?'

হাসি খুশি, সদা প্রফুল্ল ভাব ফিরে পেলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, 'সম্পূর্ণ। ধরে নিন, ফোর্ট নক্সের ভল্টে রয়েছেন আপনারা।'

ঠিক এই সময় পরপর পাঁচটি ঘটনা ঘটল। একটা দাগ আঁকা আছে, ব্রিজের মধ্যভাগ নির্দেশ করে। ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করল লীড কোচ এই দাগ পেরিয়ে আসার পরপরই।

রিয়্যার কোচে সামনে কনসোল নিয়ে বসে আছে কবীর চৌধুরী, কনসোলের একটা বোতামে চাপ দিল সে। দু'সেকেন্ড পর লীড কোচের সামনের অংশে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটল, ড্রাইভারের একরকম পায়ের নিচেই। আহত হয়নি, কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল লোকটা, বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে চাপ দিল ব্রেক পেডালে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

'সুইট জেসাস!' ঘাবড়ে গেল ড্রাইভার। কোচের হাইড্রলিক লাইন অদৃশ্য হয়েছে, বুঝতে আরও এক সেকেন্ড সময় নিল সে। হ্যান্ড-ব্রেক টেনে লকড পজিশনে নিয়ে এল, তারপর ফার্স্ট গিয়ার দিল। সাথে সাথে কমতে শুরু করল কোচের গতি।

দু'হাত সামনে বাড়িয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের দু'পাশটা ধরল কবীর চৌধুরী। পিছনে, তার সঙ্গীরাও তাই করল—যে যার সামনের সীটের পিছনটা দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন করল। প্রথম সারির সীটে কোন আরোহী নেই। গিয়ার নিউট্রালে নিয়ে এসে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্রেক পেডালে চাপ দিল রস পেরট, যেন মেঝে ফুটো করে নিচের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে ওটাকে।

রিয়্যার কোচের পিছনে পুলিস কার রয়েছে। রিয়্যার কোচ ব্রেক করলে পিছনে

লাল আলো জ্বলার কথা, জ্বলল না, তার কারণ আগেই তার ছিঁড়ে রেখেছে পেরট। মোটর শোভাযাত্রা এগোচ্ছিল ধীর গতিতে, ঘন্টায় পঁচিশ মাইল, পুলিস কারও রিয়্যার কোচের পঁচিশ ফিট পিছনে থেকে অনুসরণ করে আসছিল। পুলিস কারের ড্রাইভারের মনে কোন রকম উদ্বেগ বা সন্দেহ ছিল না, জানে, মোটর শোভাযাত্রা উপলক্ষে আজ সকালে ব্রিজের ওপর সাধারণ যানবাহন চলাচল নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। কার চালাবার ফাঁকে দু'এক সেকেন্ডের জন্যে দু'পাশের অপরূপ সৌন্দর্য দেখার লোভও তাই সামলায়নি সে। তাই, বিপদ যখন টের পেল, দুটো গাড়ির মাঝখানের দূরত্ব কমে তখন অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। পাকা ড্রাইভার, কিন্তু বিস্ময় সামলে তৎপর হতে সে-ও যথেষ্ট সময় নিল। ব্রেক করল সজোরে এবং অকস্মাৎ, কিন্তু তখন রিয়্যার কোচ থেকে দূরত্ব মাত্র পাঁচ ফিট।

নিরেট এবং অচল একটা জিনিসের সাথে ঘন্টায় বিশ মাইল গতিতে ছুটে এসে ধাক্কা খাওয়া, আরোহীদের জন্যে মোটেও কৌতুককর কোন ব্যাপার নয়। চারজন পুলিস অফিসার, কম বেশি সবাই চোট পেল।

সংঘর্ষের মুহূর্তটিতে কন্ট্রোল প্যানেলের আরও একটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। লীড কোচ, যার গতি শুধু হ্যান্ডব্রেকের সাহায্যে শ্লথ হচ্ছে, এই মুহূর্তে গতি ঘন্টায় দশ মাইল, তার পিছন দিকের ড্রিঙ্ক কেবিনেটে ছোট্ট আরও একটা বিস্ফোরণ ঘটল। বিস্ফোরণের পরপরই হিস্‌স্‌ শব্দ শোনা গেল, যেন প্রচণ্ড চাপে পড়ে আটকা পড়া বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা কম্পার্টমেন্ট ঘন, ধূসর রঙের গ্যাসে ঢাকা পড়ে গেল। ড্রাইভার জ্ঞান হারাবার সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল কোচ, ডান দিকে সরে গিয়ে রাস্তার কিনারা দু'ফিট থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্রিজের ধারে সেফটি ব্যারিয়ার রয়েছে, ট্যাংকের চেয়ে দুর্বল কিছু এসে ধাক্কা দিলে ওটার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচ কোন বিপদে পড়ল না। লীড কোচের ওয়ার্নিং লাইট জ্বলে উঠতে দেখে ঠিক সময়েই ব্রেকে চাপ দিল ড্রাইভার, ডান দিকে সরে যাওয়া লীড কোচকে এড়াবার জন্যে আরও একটু বাঁ দিকে সরে গেল সে, থামল সেটার পাশেই। বারোজন আরোহীর প্রত্যেকের চেহারায় অসুখী ভাব ফুটল, হেরফের শুধু মাত্রার। এখনও কেউ তাঁরা সন্দিহান বা সতর্ক হয়ে ওঠেননি।

শোভাযাত্রার নাকের ডগায় ছিল দু'জন মোটর সাইকেল আউটরাইডার আর একটা পুলিস কার। আশ্চর্যই বলতে হবে, পিছনে এতক্ষণ ধরে যা ঘটছে, তার কিছুই তারা টের পায়নি। লীড কোচ দাঁড়িয়ে পড়েছে, এইমাত্র লক্ষ্য করল ওরা। সাথে সাথে ঘুরতে শুরু করল।

ওদিকে রিয়্যার কোচে সব কিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘটছে। বাঁ-হাতি দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে নিচে নামল রুস পেরট, চার্লি নামল উল্টো দিকের দরজা দিয়ে, ঠিক যখন দু'জন মোটর সাইকেল আউটরাইডার কোচের প্রায় পাশে এসে দাঁড়াল। পেরট বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠুন! এক গোঁয়ারগোবিন্দ ঝামেলা করছে।'

মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে পেট্রলম্যান দু'জন লাফ দিয়ে কোচে উঠল। যে দুটো মোটরসাইকেল আর পুলিস কার ফিরে আসছে, তাদের আরোহীরা এই পেট্রলম্যানদের এখন আর দেখতে পাবে না, কাজেই এদের ব্যবস্থা

করার মধ্যে কোন ঝুঁকি নেই। কোচে উঠেই পেট্রলম্যানরা পিছন দিকে এগোল, সরু প্যাসেজে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একজন লোককে পড়ে থাকতে দেখল ওরা। ওদের পিছন থেকে নির্দেশ এল, 'হল্ট!' দু'জনই পাথর হয়ে গেল।

কোচের দরজা দিয়ে এক এক করে দ্রুত সাতজন লোক বেরিয়ে এল। এদের পাঁচজন যোগ দিল পেরট আর চার্লির সাথে, তারপর সামনের কোচগুলোর দিকে ছুটল।

বাকি দু'জন ছুটল পিছন দিকে, নাক ভাঙা পুলিস কার লক্ষ্য করে। কোচের ভেতর আরও দু'জন লোককে দেখা গেল, পিছনের দরজাটা দড়াম করে খুলল তারা, নিরীহদর্শন একটা টিউব আকৃতির ইস্পাতকে তেপায়ার ওপর বসাল। কবীর চৌধুরী আর রোজেন যেখানে ছিল সেখানেই থাকল। হাত-পা বাঁধা লোকটাও পড়ে থাকল প্যাসেজে। তার মুখে তুলো গোঁজা রয়েছে, কিন্তু চোখ দুটো খোলা। রাজ্যের ঘৃণা আর জিঘাংসা নিয়ে রোজেনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কারণ রোজেনই তার পরিচয় ছিনতাই করেছে।

পুলিস কারের দিকে যারা ছুটে গেল তাদের নাম টেরি আর হুয়ান। গিয়ে দেখল, সামনের দরজার দুটো জানালাই খোলা, অর্থাৎ কাঁচ নামানো। ভেতরের চারজন অফিসার সবাই চোট পেয়েছে, তবে কারও অবস্থাই গুরুতর নয়। ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটার নাক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে, নাকের হাড় যে ভেঙে গেছে সন্দেহ নেই। পিছনে বসা আরেকজনের কপাল ফুলে আলু। সংঘর্ষের ফলে সবাই হতভম্ব, এখনও নিজেদের সামলে নিতে পারেনি। এটা একটা বিপদ, হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে তৈরি থাকা দরকার, এই চিন্তা উদয় হয়নি কারও মাথায়। টেরি আর হুয়ান দু'জন দু'দিকের দরজা খুলে ওদের হাল হকিকত জানতে চাইল, ভাল করে না শুনেই চু-চু আওয়াজ করে সহানুভূতি প্রকাশ করল, সেই সাথে নিজেদের কাজও গুছিয়ে নিচ্ছে। হাতল ঘুরিয়ে সামনের জানালা দুটোর কাঁচ তুলে দিল ওরা। টেরি তার দরজাটা বন্ধ করল। আর হুয়ান নিজের দরজা বন্ধ করার আগে গাড়ির ভেতর একটা গ্যাস বোমা ফেলল।

পুলিস কার আর মোটরসাইকেল আউট রাইডাররা ফিরে আসছে। এই দৃশ্য তাদের কারও চোখে পড়ল না। গাড়িগুলো দাঁড়াল, আরোহীরা নামল, তারপর সতর্কতার সাথে এগোল লীড কোচের দিকে। এই সময় ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল রস পেরট, চার্লি আর তাদের সঙ্গীদের। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে কোন না কোন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।

'জলদি!' গলার রগ ফুলে উঠল পেরটের। 'আড়াল নাও! ওই কোচের পেছনে দু'জন বেজন্মা ওত পেতে আছে—একজনের কাছে বাজুকা, আরেকজনের কাছে মেশিন-পিস্তল। কোচের পিছনে, জলদি!'

পুলিস অফিসাররা তাড়াতাড়ি পিঠ দেখাল। প্রেসিডেনশিয়াল কোচ থেকে ওদেরকে দেখা যাচ্ছে কিনা চট করে পরীক্ষা করল পেরট। যাচ্ছে না। ওদিক থেকে অবশ্য কোন বিপদ আসবে বলে মনে করছে না সে। তবে ওদের কীর্তিকলাপ দেখতে পেলে আরোহীরা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেবে দরজা। তখন তালা ভাঙা একটা ঝামেলা হয়ে দাঁড়াবে।

চার্লিকে ইঙ্গিত দিল পেরট, আরেকজন লোককে নিয়ে কোচের পিছন দিকে চলে গেল সে। পুলিস অফিসাররা তাকে অনুসরণ করতে যাবে, পিছন থেকে চার্লি বলল, 'খুন হতে না চাইলে মাথার পিছনে হাত তোলো!'

দাঁড়িয়ে পড়ল ছয়জন।

'ঘোরো। সাবধান।'

ঘুরে ওরা দেখল, একজোড়া সাবমেশিন-পিস্তল ওদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চেহারা থেকে রাগ এবং আত্মবিশ্বাস দুটোই অদৃশ্য হলো ওদের। ওদের ওপর নজর রাখল চার্লি, অপর একজন ওদের রিভলভারগুলো হোলস্টার থেকে বের করে নিল। পেরট তার সঙ্গীকে নিয়ে প্রেসিডেনশিয়াল কোচে উঠছে দেখতে পেয়ে, পড়িমরি করে সেদিকে ছুটল বাকি দু'জন লোক।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচের আরোহীরা বিপদ সম্পর্কে এখনও কিছু জানেন না। একটু বিরক্ত, একটু হতাশ, খানিকটা বিষণ্ণ দেখাল তাঁদের, কিন্তু কাউকেই অস্থির বা উদ্বিগ্ন দেখাল না। আরোহীদের দু'একজন আসন ছেড়ে গাত্রোত্থানের উদ্যোগ নিচ্ছেন, এই সময় ধাপ বেয়ে কোচে উঠতে দেখা গেল রস পেরটকে।

'সুধীবৃন্দ, আপনারা সবাই আরাম করে বসুন,' বলল সে। 'কিছু না, সামান্য একটু দেরি।' সাদা কোটের এমনই মহিমা—রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলে একজন কসাইয়ের পরনে শুধু যদি অ্যাপ্রনও থাকে, ভিড়ের ভেতর তার জন্যে রাস্তা তৈরি হয়ে যায়—গায়ে ঢিল দিয়ে শান্ত হলো সবাই।

সবাইকে শান্ত করার কাজটি শেষ করেই কোটের ভেতর থেকে কদাকার চেহারার একটা অস্ত্র বের করল পেরট। ডাবল ব্যারেল, বারো বোর শটগান, সহজে সাথে রাখার জন্যে ব্যারেল আর স্টকের বেশির ভাগ কেটে ফেলা হয়েছে।

রাজার চেহারায় কৌতুক ফুটে উঠল, প্রিন্সের কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কি কোন বিশেষ অর্থ আছে বলে মনে করেন আপনি?'

'হাইজ্যাক, হোল্ড-আপ, কিডন্যাপ,' প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে কথা বলছে পেরট, 'এটাকে যা খুশি বলতে পারেন আপনারা। আপনাদের ভালর জন্যে আমার তরফ থেকে সবাইকে একটাই অনুরোধ, কেউ নড়াচড়া করবেন না।'

'গুড গড ইন হেভেন!' এইটুকু বলেই ভাষা হারিয়ে ফেললেন প্রেসিডেন্ট। খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন তিনি—কুমড়ো আকৃতির মাথা, খুলির সাথে সাঁটা কান, চ্যাপ্টা নাক—চেহারাটা বাঘের মত, কিন্তু ঠোঁটে রয়েছে বিষাদ মাখা একটু হাসি। এমন ভাবে তাকিয়ে থাকলেন, রস পেরট যেন অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছে, এই দুনিয়ার মানুষ নয়। মুহূর্তের জন্যে রাজা আর প্রিন্সের দিকে একবার তাকালেন তিনি। তারপর আবার ঝট করে ফিরলেন পেরটের দিকে। প্রচণ্ড রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল তাঁর চেহারা, কিন্তু নিজেকে বিস্ফোরিত হতে দিলেন না। এরচেয়ে অনেক বড় সংকটেও নিজেকে শান্ত রাখতে অভ্যস্ত তিনি। তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে হে তুমি? আমি জানতে চাইছি, তুমি সুস্থ কিনা। আমি কে, জানো? যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলেছ?'

'জানি।' বিষণ্ণ হাসিটুকু পেরটের ঠোঁটে আরও অস্পষ্ট হয়ে পড়ল। 'নিয়তি আপনাকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে ছেড়েছে। আর আমার নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে

এসে প্রেসিডেন্টের দিকে বন্দুক ধরতে বাধ্য করেছে। এ-ব্যাপারে আমার বা আপনার কারও কিছু করার নেই। তবে, একথা ঠিক, প্রেসিডেন্ট হওয়াই আপনার কাল হয়েছে। অবশ্য, আরও অনেক প্রেসিডেন্টের বেলায়ও কথাটা সত্যি। প্রেসিডেন্টের দিকে বন্দুক তাক করা আমেরিকার ইতিহাসে নতুন কোন ঘটনা নয়, তাই না? প্লীজ, আমার কাজে বাধা দেবেন না।'

চীফ অভ স্টাফ জেনারেল পীলের দিকে সরাসরি তাকাল পেরট। কোচে ওঠার মুহূর্ত থেকে জেনারেলের দিকে একটা সতর্ক চোখ রেখেছে সে। 'জেনারেল, আপনার সাথে সবসময় একটা পিস্তল থাকে। প্লীজ, আমাকে সেটা দিন। কোন রকম চালাকি করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না; নিশানা ঠিক হলে, আপনার পয়েন্ট টুটু-ও কম ভয়ঙ্কর নয়। তবে, আমার হাতের এটার সাথে তুলনা চলে না; ট্রিগারটা যদি টেনে দিই, আপনার বুকে একটা সুড়ং তৈরি হবে, এদিকে ঢুকিয়ে ঠেলা দিলে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে একটা টেনিস বল। আমি জানি, সাহস আর আত্মহননের ঝোঁক, এই দুটোকে এক করে গুলিয়ে ফেলার লোক আপনি নন।'

চীফ অভ স্টাফের চেহারা দেখে মনে হলো, তিনি হাসি চাপছেন। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন একবার। পকেট থেকে খুদে একটা কালো অটোমেটিক বের করে বাড়িয়ে দিলেন পেরটের দিকে।

আলগোছে সেটা নিল পেরট, বলল, 'ধন্যবাদ। আপনাদের কার কপালে কি আছে, আমি জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি আমাদের কারও বিরুদ্ধে যদি কেউ আঙুলটিও নাড়েন, অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। শান্ত হয়ে বসে থাকুন, কেউ আপনাদের কোন ক্ষতি করবে না।'

কোচের ভেতর অটুট নিস্তব্ধতা নামল। বাদশার চোখ দুটো বন্ধ, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা; মনে হচ্ছে প্রার্থনা করছেন। হঠাৎ করেই চোখ মেলে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর জানতে চাইলেন, 'ফোর্ট নক্সের ভল্ট, মি. প্রেসিডেন্ট, ঠিক কতটুকু নিরাপদ?'

'হোয়াট! এ অসম্ভব! এ আমি বিশ্বাস করি না!'

'বিশ্বাস করলে ভাল করবে, ডিকসন,' বলল কবীর চৌধুরী। একটা হাতে ধরা মাইক্রোফোনে কথা বলছে সে। 'প্রেসিডেন্ট, বাদশা আর প্রিন্স এখন আমাদের মুঠোয়।'

'কিন্তু···এ সম্ভব নয়!'

'দু'এক মিনিট যদি অপেক্ষা করো, প্রেসিডেন্ট নিজেই তোমাকে কনফার্ম করবেন। ইতিমধ্যে, প্লীজ, বোকার মত কিছু করে বোসো না, বা আমাদের কাছে পৌঁছুবার কোন চেষ্টা কোরো না। আমরা বরং তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। দক্ষিণ প্রবেশ মুখের কাছে কয়েকটা পেট্রল কার আছে তোমাদের, তাই না? ওগুলোর সাথে তোমার রেডিও যোগাযোগও আছে, ঠিক?'

একজন চীফ অভ পুলিস সম্পর্কে যার যে ধারণাই থাকুক, তার সেই ধারণার সাথে আর্ল ডিকসনের চেহারা কোন মতেই মিলবে না। তালপাতার সেপাই,

বাতাসে উড়ছে বলে মনে হয়। চোখে ভারি পাওয়ারের বাই ফোকাল। মাথায় চুল প্রচুর, কিন্তু ব্রাশ করার সময় হয় না। তাঁকে দেখে নাম করা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বলে মনে হয়। খুব বেশি লম্বা বলেই বোধহয়, একটু কুঁজো দেখায়। পরনে রক্ষণশীল পোশাক, দাড়ি-গোঁফ সব কামানো। বয়স পঞ্চান্ন, কিন্তু দেখে মনে হয় পঁয়ষট্টি। অসাধারণ বুদ্ধি রাখেন বলেই কয়েক হাজার ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক আজ তাঁর এলাকায় স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত। তাদের প্রাণের দুশমন হলেও, তারা সবাই স্বীকার করে, চীফ অভ পুলিস হিসেবে ডিকসনের চেয়ে যোগ্য লোক এই এলাকায় এর আগে কেউ আসেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে, আর্ল ডিকসনের অসাধারণ বুদ্ধিও, সাময়িক ভাবে হলেও, বেশ কিছুটা ঘোলা হয়ে পড়েছে। তাঁকে হতভম্ব দেখাল। বললেন, 'ঠিক।'

'গুড। অপেক্ষা করো।'

ঘাড় ফেরাল কবীর চৌধুরী। কোচের পিছন দিকে দাঁড়ানো লোক দু'জনকে ইঙ্গিত দিল। দরজার কাছে ফিট করা রিকয়েললেস মিসাইল থেকে আচমকা হুস্‌স্ করে বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। তিন সেকেন্ড পর দক্ষিণ টাওয়ারের দুই পাইলনের মাঝখানে ভোজবাজির মত ধূসর রঙের ঘন একটা মেঘ দেখা গেল। প্রতি মুহূর্তে আরও বড় হচ্ছে সেটা। মাইক্রোফোনে কথা বলল কবীর চৌধুরী। 'দেখলে, ডিকসন?'

'এক ধরনের বিস্ফোরণ,' চীফ অভ পুলিস বললেন। আগের চেয়ে অনেক শান্ত শোনাল তাঁর গলা। 'প্রচুর ধোঁয়া···কিন্তু ধোঁয়া কিনা···'

'নার্ভ গ্যাস। স্থায়ী কোন রিয়্যাকশন নেই, কিন্তু সাথে সাথে অক্ষম করে দেয়। অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে নিউট্রাল হতে সময় নেয় দশ মিনিট। এই গ্যাস যদি আমাদের ব্যবহার করতে হয়, আর তখন যদি উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর অথবা উত্তর-পুব দিক থেকে বাতাস বয়, পরিণতির জন্যে দায়ী হবে তুমি, বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

'এই গ্যাসের বিরুদ্ধে প্রচলিত মাস্ক অচল। সেটাও তুমি বোঝো তো?'

'বুঝি।'

'ওই একই ধরনের আরও একটা উইপন আছে আমাদের, ব্রিজের উত্তর দিকটা কাভার করছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'পুলিস স্কোয়াড আর ইউনিট, এবং আর্মড ফোর্সকে তুমি ব্যাখ্যা করে বোঝাবে, ব্রিজে আসার চেষ্টা করা নেহাতই বোকামি হয়ে যাবে। ওদেরকে তুমি নির্দেশ দেবে, কেউ যেন ব্রিজে আসার চেষ্টা না করে। আমার এই কথাগুলো কি পরিষ্কার বুঝতে পারছ তুমি?'

'পারছি।'

'আমি জানি, এরই মধ্যে রিপোর্ট পেয়েছ তুমি, দুটো ন্যাভাল হেলিকপ্টার ব্রিজের ওপর চক্কর দিচ্ছে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।' পুলিস প্রধানের চেহারা থেকে বিধ্বস্ত ভাবটা কেটে যাচ্ছে। অসাধারণ বুদ্ধি একটু একটু করে ফিরে পেতে শুরু করেছেন তিনি। 'সত্যি কথা বলতে কি, ও-দুটোর উপস্থিতি আমাকে একটু ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে।'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, মাথাটা খাটাও,' উপদেশ দিল কবীর চৌধুরী। 'তুমি অত্যন্ত

বুদ্ধিমান লোক, আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করি, এই মুহূর্তে তোমার বুদ্ধি ঠিক থাকুক। কারণ, তুমি যদি বুদ্ধি হারিয়ে ফেল, সমূহ বিপদ ঘটে যাবার আশঙ্কা তাতে শুধু বাড়বে। সামান্য দুটো 'কপ্টার দেখে যদি ধাঁধায় পড়ে যাও, সেটা শুভলক্ষণ বলে ভাবতে পারি না। ও-দুটো এখন আমাদের হাতে। আমার কথা ঠিক মত শুনছ তো, ডিকসন?'

'শুনছি।'

'আরও মনোযোগ দিয়ে শোনো, আখেরে ভাল হবে। সবগুলো লোকাল আর্মি আর ন্যাভাল এয়ার কমান্ডারের হেডকোয়ার্টারে অ্যালার্ম পাঠাও। ওদেরকে বলো, ও-দুটো হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামাবার জন্যে কোন ফাইটার পাঠানো হলে, বা অন্য কোন ভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করা হলে তার পরিণতিতে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর মেহমানদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে। ওদেরকে আরও বলো, কোথাও থেকে কোন প্লেন বা আর কিছু টেক-অফ করা মাত্র সাথে সাথে জানতে পারব আমরা। বলো, মাউন্ট টামালপাইজ রাডার স্টেশনও আমাদের কব্জায় চলে এসেছে।'

'গুড গড!' পুলিস প্রধানের গলাটা একটু কেঁপে গেল।

'তিনি এই মুহূর্তে তোমাকে কোন সাহায্য করবেন না। রাডার স্টেশনে আমার লোক যারা রয়েছে, তারা সবাই যোগ্য রাডার অপারেটর। ওই স্টেশন উদ্ধার করার জন্যে আর্মি, নেভি বা এয়ারফোর্স কেউ কোনরকম চেষ্টা চালাতে পারবে না। যদি চালায়···কি হবে, ডিকসন?'

'কি?'

'রাডার স্টেশন দখল করার জন্যে কোন হামলা চালানো হলে, আমি জানি, সেটা আমরা ঠেকাতে পারব না,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানি, হামলাটা চালাবার নির্দেশ যার কাছ থেকে আসবে তার ওপর প্রেসিডেন্ট খুশি হবেন না। কারও বোকামির জন্যে তাকে যদি একটা কান হারাতে হয়, কিভাবে তার ওপর খুশি হবেন তিনি, ডিকসন?'

'বলুন!'

'সেই লোকের ওপর আরব বাদশা আর প্রিন্সও খুশি হবেন না। তেল বিক্রি করতে এসে যদি কান কাটা যায়, সে দুঃখ তাঁরা রাখবেনই বা কোথায়! ডিকসন?'

'বলুন!'

'আমার কথা স্পষ্ট?'

'জ্বী।'

'ভেব না, আমি সিরিয়াস নই। তিনটে ডান দিকের কান প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে ডেলিভারি দেব আমরা।'

'কথা দিচ্ছি রাডার স্টেশন দখল করার জন্যে কোন রকম চেষ্টা চালানো হবে না।'

অত্যন্ত যোগ্য অফিসার ক্যাপ্টেন ওয়াকার। পুলিস চীফ তাকে নিজের ডান হাত বলে মনে করেন। ওয়াকারের মাথায় সোনালি চুল, চোখে বুদ্ধির ঝিলিক, সদা হাস্যময়। পুলিস প্রধানের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হ ৎ দ্রুত একবার চোখ

রগড়াল। না, ভুল দেখেনি সে। চীফ সত্যি ঘামছেন। দশ বছর একসাথে কাজ করছে তারা, চীফকে এই প্রথম ঘামতে দেখল সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নিজের কপাল স্পর্শ করল ওয়াকার। হাতটা নামিয়ে চোখের সামনে ধরল। ঘামে ভেজা হাতটা চিকচিক করছে দেখে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল সে।

'আশা করি,' কবীর চৌধুরী বলল, 'তুমি কথা রাখবে। একটু পর আবার যোগাযোগ করব।'

'আমি যদি ব্রিজের কাছে যাই, কোন আপত্তি নেই তো? যতটুকু বুঝতে পারছি, একটা কমিউনিকেশন হেডকোয়ার্টার দরকার হবে আমার। সেটা ব্রিজের যত কাছে হয় ততই ভাল।'

'আসো ব্রিজের কাছে, কিন্তু ব্রিজের ওপর পা দিয়ো না। আরেকটা কথা, প্রেসিডিয়ো-তে কোন প্রাইভেট কার ঢুকতে চাইলে সেটাকে যেন বাধা দেয়া হয়। আগে আমি ভায়োলেন্সের ভক্ত ছিলাম, এখন আমি ওটার ঘোর বিরোধী। একেবারে বাধ্য না হলে ভায়োলেন্সের আশ্রয় নিতে চাই না। কিন্তু যদি নিতেই হয়, আমি চাই না কোন নিরীহ লোক ভুগুক।'

'আপনি অত্যন্ত বিবেচক,' পুলিস প্রধানের গলার সুরে তিক্ততা।

মুচকি একটু হেসে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখল কবীর চৌধুরী।

লীড কোচ থেকে অদৃশ্য হয়েছে গ্যাস, কিন্তু তার প্রভাব থেকে এখনও মুক্ত হয়নি আরোহীরা। কেউ কেউ সীট থেকে পাশের প্যাসেজে পড়ে গেছে, তবে এই পতনের ফলে আহত হয়নি কেউ। অনেকেই সীটের পিছনে হেলান দিয়ে আছে, যেন গভীর ঘুমে অচেতন কয়েকজন ঝুঁকে রয়েছে সামনের দিকে, সামনের সীটের পিঠে ঠেকে আছে মাথা। এখনও জ্ঞান ফেরেনি কারও।

প্রতিটি আরোহীর পাশে থামছে ওরা দু'জন, উদ্দেশ্য যদিও খেদমত করা নয়। দু'জনের একজন চার্লি, অপরজনের নাম নটহ্যাম। নটহ্যাম বিশ বছরের তরুণ, তার শরীরের প্রতিটি ইঙ্গিতে লেখা আছে সে একজন কলেজ ছাত্র অথচ আসলে এক ইঞ্চিও তা নয়। কোচের প্রতিটি আরোহীকে সার্চ করেছে ওরা। বাধা দেয়ার নেই কেউ, কাজটা খুব নির্ঝঞ্ঝাটে ও নিখুঁতভাবে সারতে পারছে। মেয়ে রিপোর্টারদের দেহ তল্লাশী বাদ দেয়া হলো, কিন্তু তাদের হাত-ব্যাগগুলো যত্নের সাথে খুঁটিয়ে দেখা হলো। এই তল্লাশী চালাবার সময় চার্লি আর নটহ্যামের হাতে কয়েক হাজার ডলার পড়বে, কবীর চৌধুরী সেটা আগেই আন্দাজ করেছিল। তাই নিষেধ করে দিয়েছে, একটা কানাকড়িও যেন ওদের পকেটে না ঢোকে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছ থেকে একটা পয়সা নিতেও রাজি নয় কবীর চৌধুরী, কিন্তু টাকার কুমীরদের কাছ থেকে যতটা পারা যায় বাগিয়ে নিতে তার কোন আপত্তি নেই।

টাকা নয়, অস্ত্র খুঁজছে ওরা। কবীর চৌধুরী ধারণা করেছিল, রিপোর্টারদের কোচে পরিচয় ভাঁড়িয়ে এফ. বি. আই. থাকবে। তার ধারণা মিথ্যে নয় এফ. বি. আই-এর স্পেশাল কয়েকজন এজেন্ট লীড কোচে রয়েছে, যদিও প্রেসিডেন্টকে সরাসরি রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে আসেনি তারা। তাদের দায়িত্ব ছিল, রিপোর্টারদের ওপর নজর রাখা।

আরব তেলের মালিকরা যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসছেন, এই খবর রটে যাবার সাথে সাথে সারা বিশ্বের স্বার্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, ফলে বিদেশী রিপোর্টাররা পিল পিল করে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ে, তাদের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজনকে প্রেসিডেন্ট এবং তেল মালিকদের কাছে ঘেঁষার ছাড়পত্র দেয়া হয়। এই মোটর শোভাযাত্রায় সঙ্গী হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে দশ জন বিদেশী রিপোর্টারকে—চারজন ইউরোপের, তিনজন গালফ স্টেটের, একজন ভারতের (কাজ করে লন্ডনের দ্য নিউজে), একজন ভেনেজুয়েলার, আরেকজন নাইজেরিয়ার।

সার্চ করে তিনটে আগ্নেয়াস্ত্র পেল ওরা। আগ্নেয়াস্ত্রের তিনজন মালিকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো, তবে যেখানে ছিল সেখানেই রাখা হলো তাদেরকে। কোচ থেকে নেমে এল চার্লি আর নটহ্যাম। কাছেই ছয়জন হাতকড়া পরানো পুলিসকে পাহারা দিচ্ছে ওদের একজন সঙ্গী। আরেকজন সঙ্গী বাজুকা-সদৃশ মিসাইল ফায়ারার-এর পিছনে বসে উত্তর টাওয়ারটা পাহারা দিচ্ছে। এখানে, দক্ষিণ প্রান্তে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। কবীর চৌধুরীর কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি।

চার

রিয়্যার কোচের ধাপ বেয়ে নিচে নামল কবীর চৌধুরী। তাকে দেখে খুশি বা অখুশি কিছুই মনে হলো না। তার মনের ভাব অনেকটা এইরকম—যেটা যেভাবে ঘটবে বলে আশা করেছিল, সেটা ঠিক সেভাবে ঘটেছে, এর মধ্যে খুশি বা অখুশি হবার কিছুই নেই। কোথাও যদি অন্য রকম কিছু ঘটত, অখুশি নয়, বিস্মিত হত সে।

তার সাগরেদরা প্রায়ই তার আড়ালে বলাবলি করে, নিজের ওপর মিস্টার কবীর চৌধুরীর অগাধ বিশ্বাস। এই রকম আকাশচুম্বি আত্মবিশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করার অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা। সংখ্যায় ওরা আঠারো জন প্রত্যেকেই কোন না কোন কারণে একাধিকবার জেলের ঘানি টেনেছে। কিন্তু সেটা কবীর চৌধুরীর দলে নাম লেখাবার আগেকার ঘটনা। আজ ছয়-সাত মাস হলো কবীর চৌধুরীর সাথে আছে ওরা, সেই থেকে আঠারো জনের একজনও এমন কিছু করেনি যাতে পুলিস ওদেরকে খুঁজতে আসবে। দলে নাম লেখাবার পর থেকে ওদের আচরণ আর চলাফেরা কবীর চৌধুরী নিজেই নিয়ন্ত্রণ করছে, ওদের এই হঠাৎ ভাল মানুষ হয়ে ওঠার পিছনে সেটাই আসল কারণ। কিন্তু এর মানে এই নয় যে কবীর চৌধুরী রাতারাতি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু আইন সে ভাঙছে না, এ-কথা ঠিক। কিন্তু তার অন্য কারণ রয়েছে।

রাশিয়ানদের কাছে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেনা রয়েছে কবীর চৌধুরীর। কিছুদিন থেকে দেনাটা শোধ করার জন্যে জোর তাগাদা দিচ্ছে মস্কো। অনেক ভেবে-চিন্তে যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ট নক্স লুট করার একটা প্ল্যান তৈরি করে কবীর

চৌধুরী। কিন্তু তার সেই প্ল্যানের কথা কিভাবে যেন রাশিয়ানরা জেনে ফেলে। মস্কোয় ডেকে পাঠিয়ে কবীর চৌধুরীকে বলা হয় দুটো কারণে ফোর্ট নক্স লুট করতে পারবেন না আপনি। এক, আপনার সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে, যুক্তরাষ্ট্র তা জানে। আপনি ভয়ঙ্কর কোন অপরাধ করলে আমাদেরকেও দায়ী করা হবে। দুই, অগুণতি লোককে খুন না করে ফোর্ট নক্স লুট করা সম্ভব নয়। আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে, তাই এই কাজে আমরা সমর্থন জানাতে বা অনুমতি দিতে পারি না। আমাদের টাকা আপনাকে শোধ করতে হবে, কিন্তু মানুষ খুন করে নয়।

শুধু যে টাকা ধার করেছে তাই নয়, রাশিয়ার সাথে আরও অনেক বাঁধনে জড়িয়ে গেছে কবীর চৌধুরী। ইচ্ছে করলেই সে-সব বাঁধন ছিঁড়ে হঠাৎ করে বেরিয়ে আসতে পারে না সে। কাজেই একটা শর্ত মেনে নিতে হয়েছে তাকে। মস্কোকে কথা দিয়ে এসেছে, একান্ত বাধ্য না হলে মানুষ খুন করবে না।

ফোর্ট নক্স লুট করার প্ল্যানটা বাতিল করলেও, আরেকটা প্ল্যান তৈরি করতে বেশি সময় লাগেনি তার। এই প্ল্যানের কথা কেউ যাতে টের না পায়, সেজন্যে বিশেষ ভাবে সতর্ক ছিল সে। তার সঙ্গী-সাথীদের পুলিস যদি খোঁজে, মস্কোর চররাও সে-খবর জানতে পারবে, গন্ধ শুঁকে কবীর চৌধুরীর সন্ধান বের করে ফেলবে তারা। সেজন্যেই শিষ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে তাকে। শর্ত মেনে নিয়ে মস্কো থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে প্রকাশ্য কোথাও চেহারা দেখায়নি সে।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দিকে এগোল কবীর চৌধুরী। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল পেরট, তাকে বলল, 'লীড কোচটাকে একটু সামনে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার ড্রাইভারকে পিছু নিতে বলো।'

লীড কোচে উঠে ভালুক আকৃতির চার্লির সাহায্যে অচেতন ড্রাইভারকে তার সীট থেকে সরিয়ে হুইলের পিছনে বসল কবীর চৌধুরী। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল, গিয়ার এনগেজ করল, কোচটাকে সিধে করে নিয়ে পঞ্চাশ গজের মত এগোল সামনের দিকে। তারপর হ্যান্ড-ব্রেকের সাহায্যে থামাল সেটাকে। লীড কোচের পিছু পিছু এল প্রেসিডেনশিয়াল কোচ, মাঝখানে মাত্র কয়েক ফিট ব্যবধান রেখে সেটাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

লীড কোচ থেকে নেমে দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে ফিরে চলল কবীর চৌধুরী। ব্রিজের ঠিক মাঝখানে এসে থামল সে। ব্রিজের এখানটাতেই বিশাল সাসপেনশন কেবলগুলো সবচেয়ে বেশি নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। পিছন দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী, তারপর আবার সামনের দিকে। ব্রিজের মাঝখানের পঞ্চাশ গজ সম্পূর্ণ ফাঁকা, কেবলগুলো নিচের দিকে নেমে আসায় হেলিকপ্টারের রোটরের সাথে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও কম। ফাঁকা জায়গাটা থেকে সরে এসে ওপর দিকে মুখ তুলল কবীর চৌধুরী, ব্রিজের ওপর একটানা ঘ্যানর ঘ্যানর করছে 'কপ্টার দুটো, হাত নেড়ে তাদেরকে নির্দেশ দিল সে। খুব সহজেই মেশিন দুটো নিয়ে নেমে এল ওয়াল্টার আর মারকুয়েজ। দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম গোল্ডেন গেট ব্রিজকে হেলিপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করা হলো।

ভাব-গম্ভীর চেহারা নিয়ে প্রেসিডেনশিয়াল কোচে উঠল কবীর চৌধুরী। সাথে সাথে আরোহীরা সবাই উপলব্ধি করলেন, এই লোকই কিডন্যাপারদের নেতা। এই লোকের জন্যেই তাঁদের আজ এই ভোগান্তি। বাদশা এবং প্রিন্স, তাঁরা দু'জনেই কবীর চৌধুরীর দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকালেন। স্টিফেন বেকার, প্রেসিডেন্টের এনার্জি জার, আগের চেয়েও নার্ভাস দেখাল তাঁকে, হাত আর চোখ দুটো স্থির রাখতে পারছেন না। আন্ডার সেক্রেটারি অভ স্টেট জেমস ফেয়ার, সচরাচর তাঁকে দেখে যা মনে হয় এখনও তাই মনে হলো—ঢুলছেন। চোখ দুটো আধ-বোজা, যে-কোন মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মেয়র মাইক সিলভার প্রসঙ্গে প্রথমেই যেটা বলতে হয়, সামরিক বাহিনীতে এবং সিভিল সার্ভিসে কাজ করার সময় এত বেশি মেডেল পেয়েছেন তিনি, সবগুলো তাঁর ওই প্রশস্ত বুকেও ঠাসাঠাসি হচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছেন তিনি।

রাগে লাল হয়ে উঠেছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্টও। কিন্তু তাঁর চোখ দুটো শান্ত, ঠাণ্ডা। তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ, তিনি সহজে অস্থির হয়ে ওঠেন না।

অনেকটা রাজনৈতিক নেতাদের ভঙ্গিতে দু'কোমরে হাত রাখল কবীর চৌধুরী। প্রথমে প্রেসিডেন্ট, তারপর এক এক করে আর সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। বাদশা আর প্রিন্সের দিকে যখন তাকাল, মনে হলো তার চেহারা একটু যেন কঠিন হয়ে উঠল, তবে সেটা ভুলও হতে পারে। সবশেষে প্রেসিডেন্টের ওপর ফিরে এল তার দৃষ্টি। শুরু করল সে, 'আসসালামো আলাইকুম, মি. প্রেসিডেন্ট। আমি বাংলাদেশের কবীর চৌধুরী। আমি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি...'

'থামুন!' তীক্ষ্ণ, কড়া নির্দেশের সুরে বাধা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'দয়া করে ভদ্রতার মুখোশটা খুলে ফেলুন, আমি আপনার আসল পরিচয় জানতে চাই, স্যার!'

'আমার আসল এবং অকৃত্রিম পরিচয়, বললামই তো, কবীর চৌধুরী,' তার চেহারায় ক্ষীণ একটু কৌতুকের ভাব ফুটে উঠল। 'ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলতে বলছেন, বেশ তো, তাহলে আসুন, আমরা সবাই যার যার ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলি। ভদ্রতার মুখোশ বলতে আমরা এখানে সবাই যা পরিধান করে আছি, সেগুলোকেও বোঝায়। আমি সব খুলে দিগম্বর সাজব, আর আপনারা সব পরে থেকে লজ্জা নিবারণ করবেন, সেটা উভয় পক্ষের জন্যে মহা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আমার বিশ্বাস মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি ঠিক এই কথাটি বলতে চাননি। সম্ভবত মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। তাতে কিছু এসে যায় না, ভুল মানুষেরই হয়, আমরা কেউই তো আর ফেরেস্তা নই। তবে, ভব্যতা হারিয়ে ফেলা আমাদের কারুরই উচিত হবে না।'

উপস্থিত সবাই দেখতে পেল, বিতর্কের শুরুতেই প্রেসিডেন্টকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে কবীর চৌধুরী।

কিন্তু পরমুহূর্তে প্রেসিডেন্টের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর সবাইকে সচকিত করে তুলল। তিনি বললেন, 'ভব্যতা?' তাঁর চেহারায় নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল। 'শিখতে হবে তোমার কাছ থেকে? তুমি (!)—একটা খুনে, একটা গুণ্ডা, একটা জালিয়াত, একটা বদমাশ, সাধারণ একটা ক্রিমিন্যাল—তোমার কাছ থেকে আমাকে ভব্যতা শিখতে হবে! এত বড় স্পর্ধা তোমার, ভব্যতা শেখাতে আসো!'

downloadpdfbook.com

'খুনে? না। গুণ্ডা? না। জালিয়াত? তা বলতে পারেন। বদমাশ? না। সাধারণ একটা ক্রিমিন্যাল? উঁহুঁ, হলো না। আমার মত অসাধারণ ক্রিমিন্যাল গোটা পৃথিবীতে আর একটা আছে কিনা সন্দেহ। যাই হোক, প্রসঙ্গক্রমে বলছি, আমার দয়া আর বিবেককে ঘুম থেকে জাগাতে আপনার এই অভদ্র আচরণ কোন সাহায্যে এল না। অবশ্য, আপনি যদি আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতেন, যদি সসম্মানে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিতেন, তাহলেও ওগুলোর ঘুম ভাঙতো না। অতীতে আপনার দেশ আমার সাথে যে আচরণ করেছে, আক্ষরিক অর্থেই পাষাণ হয়ে গেছি আমি।'

'আমরা কেউ আপনাকে হাত অফার করতে যাচ্ছি না, মি. চৌধুরী,' জেনারেল পীল এতই শুকনো গলায় কথা বললেন, রীতিমত কর্কশ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'দয়া করে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিলে কৃতার্থ বোধ করি। আমরা কি আপনার জিম্মি? এই দেশ আপনাকে অসম্মান করেছে, এ কি তারই প্রতিশোধ?'

'প্রতিশোধ তো বটেই।'

'আমরা কি তাহলে নিজেদের প্রাণের আশা ছেড়ে দেব?' যোদ্ধা জেনারেল এই পরিস্থিতিতেও বিদ্রূপ করার সাহস পেলেন।

'রক্তে আমার আসক্তি নেই,' কবীর চৌধুরী বলল, 'আমার চাই প্রচুর টাকা।' প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরল সে। 'মেহমানদের সামনে আমার দ্বারা আপনার যদি কোন অসম্মান বা ক্ষতি হয়ে থাকে, সেজন্যে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট।'

নিজের সামনে টেবিলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। সঙ্গী-সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জোকার! আমরা একটা জোকারের পাল্লায় পড়েছি!' কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরলেন তিনি। 'আজকে আপনি আমার কি ক্ষতি করেছেন কল্পনাও করতে পারবেন না, মি. জোকার!'

'যে কোন নামে ভূষিত করুন আমাকে, আমি প্রতিবাদ করব না,' সহাস্যে বলল কবীর চৌধুরী। 'গর্তে পড়লে সব ব্যাঙই অমন লাফায়। তবে, ভুলটা শুধরে না দিয়ে পারছি না। জোকার হাসায়, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য আপনাদেরকে কাঁদানো।' বাদশা ও প্রিন্সের দিকে তাকাল সে। 'আপনাদেরকে আমি সম্মান করব না, অসম্মানও করব না। আপনাদের অনেক টাকা আছে। আমি জানি, সে-বোঝা বইতে আপনাদের কষ্ট হয়। সেই কষ্ট থেকে যতটা পারি আপনাদেরকে রেহাই দেবার চেষ্টা করব। আপনাদের সাথে এইটুকুই আমার সম্পর্ক। তবে আপনাদের নীতি আর আচরণ সম্পর্কে কিছু বলার আছে। কথাগুলো মিষ্টি হবে, সে-নিশ্চয়তা আমি দিতে পারছি না। ইচ্ছে করলে আপনারা দু'জনেই কানে আঙুল দিতে পারেন।'

বাদশা আর প্রিন্সের দু'জোড়া চোখ ধিকি ধিকি আগুনের মত জ্বলে উঠল। কেউ তাঁরা একচুল নড়লেন না।

'আপনারা তেলের দাম বাড়িয়েছেন, সেই সাথে সারা দুনিয়ায় জিনিস পত্রের দাম বেড়ে গেছে,' শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'তেল ছাড়া দুনিয়া অচল, আর সেই তেলের একচেটিয়া মালিক আপনারা। তেলের ন্যায্য দাম বাড়ালে কারও কিছু

বলার নেই, কিন্তু ব্যবসা জিনিসটাকে আপনারা নোংরামি আর নষ্টামির পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। ব্যবসা করতে গিয়ে আপনারা হয়ে উঠেছেন লোভী, অর্থপিশাচ। মুখে আপনারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে কত ভাবেই না বলেন, কিন্তু দুনিয়ার বেশির ভাগ মুসলমান যে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, সেদিকে আপনাদের কোন খেয়াল নেই। আপনাদের খেয়াল আছে শুধু ভোগ-বিলাসের দিকে। কিন্তু আর কতদিন? তেলের মউজুদ কি শেষ হয়ে আসছে না? তারও আগে, নতুন ধরনের জ্বালানি এসে যাবে বাজারে, আমার গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে, তখন কি অবস্থা হবে আপনাদের? আপনারা পাহাড়ের গুহায় বুনো পশুদের মত বসবাস করতেন, কিছুদিন আগেও ছেঁড়া তাঁবু ছিল আপনাদের ঘর-বাড়ি, আজ সেসব কথা ভুলে গেছেন। কিন্তু আবার সেদিন ফিরে আসছে...'

তাকে বাধা দিলেন জেনারেল পীল, 'আপনার উদ্দেশ্য যাই হোক, সেটা পূরণ করার জন্যে খুব একটা তাড়া আছে বলে তো মনে হচ্ছে না!'

'ঠিক ধরছেন। আমার কোন তাড়া নেই। বরং সময় যত বেশি কাটবে, ততই লাভবান হব আমি। আমার এই কথার অর্থ আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন।' কোচের পিছন দিকে হেঁটে এল সে। প্রকাণ্ড কমিউনিকেশন কমপ্লেক্সের পিছনে এক যুবক সৈনিক বসে রয়েছে। তার সোনালি চুলের দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল, 'নাম?'

এতক্ষণ ধরে যা ঘটল, সবই দেখেছে সৈনিকটি। চেহারা কঠিন করে তুলে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'ডানকান।'

তার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'এই নম্বরের সাথে যোগাযোগ করো। এটা একটা লোকাল নম্বর।'

গ্যাঁট হয়ে বসে থাকল ডানকান।

'প্লীজ,' শান্ত সুরে বলল কবীর চৌধুরী।

এরপর আর চুপ করে থাকার সাহস হলো না ডানকানের। বলল, 'আপনি নিজে যোগাযোগ করুন।'

'আমি কিন্তু অনুরোধ করেছি!' কবীর চৌধুরীর চেহারা দেখে মনে হলো, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি।

'গো টু হেল!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘাড় ফেরাল কবীর চৌধুরী। 'পেরট?'

'ইয়েস, চীফ?'

'বেডলারকে ডেকে পাঠাও।' ডানকানের দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী। 'টেলিকমিউনিকেশন সম্পর্কে তুমি যা শিখেছ, বেডলার তার চেয়ে বেশি ভুলে গেছে। তোমার মত একটা পুঁচকে ছোঁড়া যখন বেয়াদবি করে, আমি উত্তেজিত হই না। তবে বিরক্ত বোধ করি।' আবার পেরটের দিকে ফিরল সে। 'বেডলার এখানে এলে ডানকানকে কোচ থেকে নামাবে তুমি। ওকে নিয়ে কি করতে হবে, জানো তো?'

'ইয়েস, চীফ,' দ্রুত বলল পেরট। তার মায়াভরা চোখে নিষ্ঠুরতা বা ঘৃণার ছায়া পর্যন্ত নেই। 'ওকে ব্রিজের কিনারায় নিয়ে গিয়ে গোল্ডেন গেটে ফেলে দেব।'

'হ্যাঁ।'

'স্টপ!' প্রেসিডেন্ট ঘাবড়ে গেছেন, সেটা তাঁর চেহারায় প্রকাশও পেল। 'তোমার এত বড় স্পর্ধা...'

'স্পর্ধা?' এবার কবীর চৌধুরীর চেহারায় নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল। 'স্পর্ধার আপনি দেখেছেন কি! কথা না শুনলে আপনাকেও ব্রিজ থেকে ফেলে দেয়া হবে। জানি, তিক্ত বাস্তবতাকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি যে সিরিয়াস, সেটা এক সময় না এক সময় বুঝতেই হবে আপনাদেরকে।'

আন্ডার সেক্রেটারি অভ স্টেট জেমস ফেয়ার নড়েচড়ে উঠলেন। এই প্রথম মুখ খুললেন তিনি, তাঁকে ক্লান্ত বলে মনে হলো। 'এই লোক যা বলছে, সব অন্তর থেকে বলছে—অন্তত আমার কানে সেভাবেই বাজল কথাগুলো। হতে পারে, লোকটা ঘুঘু, এক নম্বরের মিথ্যেবাদী, কিন্তু মিথ্যে বলার আর্টটা ভালভাবেই রপ্ত করেছে। মোট কথা, কোন ঝুঁকি না নেয়াই ভাল।'

আন্ডার সেক্রেটারির দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন প্রেসিডেন্ট, ইচ্ছে চুপিসারে কিছু জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু এরই মধ্যে ভদ্রলোক আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন বলে মনে হলো। শান্ত গলায় জেনারেল পীল বললেন, 'ডানকান, তোমাকে যা করতে বলা হচ্ছে, করো।'

'ইয়েস, স্যার।' সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তাকে পালন করতে না হওয়ায় মনে মনে দারুণ স্বস্তি বোধ করল ডানকান। কবীর চৌধুরী আবার হাত বাড়াতে তার হাত থেকে কাগজটা নিল সে।

'প্রেসিডেন্টের উল্টো দিকের ওই চেয়ারের পাশে যে ফোন রয়েছে, কলটা ওটায় বদলি করতে পারবে?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী। ডানকান মাথা ঝাঁকাল। 'আর প্রেসিডেন্টের ফোনে?' আবার মাথা ঝাঁকাল ডানকান। ওখান থেকে সরে এসে খালি আর্মচেয়ারে বসল কবীর চৌধুরী।

প্রথমবারই যোগাযোগ করতে পারল ডানকান। বোঝা গেল, কল পাবার জন্যে অপর প্রান্তে অপেক্ষা করছিল কেউ। সতর্ক একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ডিকসন।'

প্রেসিডেন্টের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে কবীর চৌধুরী। 'এদিকে আমি চৌধুরী।'

'হ্যাঁ। চৌধুরী। কবীর চৌধুরী। প্রথমেই আমার ধরতে পারা উচিত ছিল।' কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা, তারপর আবার বলল পুলিস চীফ, 'আপনার সাথে দেখা করার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের, মি. চৌধুরী। একা কোন মানুষ যদি বারবার যুক্তরাষ্ট্রকে উৎকট পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে থাকে তো সে আপনি। আপনার মেধা এবং বুদ্ধিকে কখনোই খাটো করে দেখিনি আমি...'

'থাক, আর প্রশংসা করতে হবে না,' পুলিস চীফকে থামিয়ে দিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরে কথা বলা যাবে, যদি সময় হয়। এখন কাজের কথা। আমার ধারণা, প্রেসিডেন্ট স্বাধীন একজন লোকের সাথে আলাপ করতে পারলে বর্তে যাবেন।' বলে টেলিফোনের রিসিভার আর সীট মেয়র মাইক সিলভারকে ছেড়ে দিল সে। প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'পুলিস চীফের সাথে কথা বলবেন কম, এবং বাজে কথা বলবেন না।'

মেয়র সিলভার পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন পুলিস চীফকে। সবশেষে বলল, 'মি. প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলো।'

টেবিলের ওপর থেকে রিসিভার তুললেন প্রেসিডেন্ট।

'এই পরিস্থিতিতে আপনি আমাকে কি করার পরামর্শ দেন, স্যার?' জানতে চাইল পুলিস চীফ আর্ল ডিকসন।

'বুদ্ধি খাটাও। আমার উপদেষ্টাদের সাথে কথা বলো।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন প্রেসিডেন্ট।

নিজের রিসিভার আবার কানে তুললেন মেয়র সিলভার। ডিকসন জিজ্ঞেস করলেন, 'চৌধুরী কি জেনারেলের সাথে আমাকে কথা বলতে দেবেন?'

'বসো, জিজ্ঞেস করে দেখি।' জিজ্ঞেস করতে সানন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল কবীর চৌধুরী।

কোচের আরোহীরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। সবাই বুঝলেন, নিজের ওপর ভয়ঙ্কর আস্থা রয়েছে চৌধুরীর। তা তো থাকবেই। তার হাতে প্যাকেটের সবগুলো টেক্কা নয়, রয়েছে প্যাকেট ভর্তি টেক্কা।

পুলিস চীফ ডিকসন জিজ্ঞেস করলেন, 'জেনারেল পীল, স্যার? ডিকসন। স্যার, সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যেই এটা একটা জাতীয় সমস্যার চেহারা পেয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব যতটুকু পুলিসের, ততটুকুই মিলিটারির। বরং একটু বেশি, ইফ আই অ্যাম এনি জাজ। উপকূলের সিনিয়র মিলিটারি অফিসারদের সাহায্য চাইব তো, স্যার?'

'আরও বড়দের ডাকো।'

'পেন্টাগন?'

'এই মুহূর্তে।'

'লোকাল অ্যাকশন, স্যার?'

'বাদ দাও। পরিস্থিতিটাকে আকৃতি পেতে দাও। আগে জেনে নিই, ঠিক কি চায় এই উন্মাদ।' জেনারেল পীলের কথা শুনে ক্ষীণ একটু হাসল কবীর চৌধুরী। 'বলছে, তার নাকি তাড়া নেই কাজেই আমাদের ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? উনি বোধহয় তোমার সাথে আবার কথা বলতে চান।'

জেনারেল পীলের কাছ থেকে রিসিভার নিয়ে আবার আর্মচেয়ারে বসল কবীর চৌধুরী। 'দু'একটা প্রশ্ন আর অনুরোধ, ডিকসন। আমার ধারণা, আমার যা পজিশন, প্রশ্নের উত্তর আর যা খুশি চাওয়ার অধিকার আমার আছে, তুমি কি বলো?'

'আমি শুনছি।'

'খবর কি ইতিমধ্যে রটে গেছে?'

'রটার আছেটা কি?' কাতর কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল পুলিস চীফ। 'সান ফ্রান্সিসকোর অর্ধেক লোক দেখতে পাচ্ছে, প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রা অপয়া ব্রিজের ওপর আটকা পড়ে আছে।'

'মুখ সামলে কথা বলো!' গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী। 'আমার প্রিয় ব্রিজ সম্পর্কে আর একটাও যদি বাজে মন্তব্য করো, তোমার কপালে খারাবি আছে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে। তারপর আবার জানতে চাইল, 'খবরটা কি গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে?'

'না পড়লেও পড়তে দেরি হবে না।'

'আমার হুকুম, খবরটা সবখানে ছড়িয়ে দাও, এখুনি। আমি চাই, কমিউনিকেশন মিডিয়াগুলো উৎসাহী হয়ে উঠুক। একটা হেলিকপ্টার যোগাড় করো তুমি...না একটা নয়, দুটো। ও-দুটোকে আমি ব্রিজে আসার অনুমতি দেব...না, আমি হুকুম করছি—ব্রিজে ও-দুটোকে পাঠাতেই হবে। কম করেও শ'খানেক নিউজ ক্যামেরাম্যান থাকা চাই ওগুলোয়, যারা এই ঐতিহাসিক ঘটনা রেকর্ড করতে আগ্রহী। উপকূল এলাকায় এ-ধরনের মেশিন প্রচুর পাবে তুমি—মিলিটারি বা সিভিলিয়ান।'

সাথে সাথে নয়, একটু থেমে ডিকসন জানতে চাইলেন, 'শ'খানেক ক্যামেরাম্যান? কেন, কি দরকার?'

'দরকার পাবলিসিটির জন্যে। আমি চাই আমেরিকার প্রতিটি লোকই শুধু নয়, দুনিয়ার প্রতিটি লোক, যাদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ আছে, নিজেদের চোখে দেখুক তোমাদের প্রেসিডেন্ট আর তার মেহমানরা কি দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে—এই রকম একটা চোখ-জুড়ানো দৃশ্য থেকে কাউকে আমি বঞ্চিত করতে চাই না। ওরা যে ফাঁদে পড়েছে, মানো?'

আবার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন ডিকসন। 'আমি যতদূর বুঝতে পারছি, এই পাবলিসিটির সাহায্যে পাবলিক সেন্টিমেন্ট নিজের দিকে আনার চেষ্টা করবেন আপনি, তাই না, মি. চৌধুরী? তাতে করে আপনি যা চাইবেন বলে ভেবেছেন সেটা পেতে সুবিধে হবে।'

'আমি তাহলে ভুল খবর পাইনি,' বলল কবীর চৌধুরী, 'তুমি সত্যি বুদ্ধিমান।'

ভারী গলায় পুলিস চীফ জানতে চাইলেন, 'কোচ ভরা রিপোর্টার পাঠালে আপনি আপত্তি করবেন?'

'তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু রিপোর্টারের ছদ্মবেশে কোচ ভরা সশস্ত্র এফ. বি. আই. এলে রেগে যাব। না, কোচ ভরা রিপোর্টার আমাদের আছে, আর দরকার নেই।'

'দুটো হেলিকপ্টারে যদি ট্রুপার বা প্যারাট্রুপার পাঠাই, কে আমাকে বাধা দেয়?'

'তোমার কমনসেন্স। আমাদের হাতে জিম্মিরা রয়েছে, নাকি এরই মধ্যে তা ভুলে গেছ? প্রেসিডেন্টের কাছে একজন প্যারাট্রুপার পৌঁছুবার অনেক আগেই একটা বুলেট পৌঁছুতে পারবে। কি, একমত?' প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল, তাকে নিয়ে দর কষাকষি তিনি মোটেও ভাল চোখে দেখছেন না।

'আপনার সে-সাহস হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না,' পুলিস চীফ বলল, 'প্রেসিডেন্টকে গুলি করলে নিজের চালেই মাত হয়ে যাবেন আপনি। আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে আপনার হাতে তখন আর কিছু থাকবে না।'

'কে বলেছে থাকবে না? একজন বাদশা, একজন প্রিন্স—এদেরকে তুমি দেখছি

মানুষ বলেই গণ্য করছ না! বলছ, আমার নাকি গুলি করার সাহসই হবে না। ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখো। পাঠাও প্যারাট্রুপার।' একসেকেন্ড থেমে আবার বলল কবীর চৌধুরী, 'আসলে, অন্ধকারে হাতড়াচ্ছ তুমি, ডিকসন। নাকি একজন প্রেসিডেন্ট, একজন বাদশা আর একজন প্রিন্সের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেতে চাও?'

পুলিস চীফ চুপ।

'মাথামোটা লোকের অভাব নেই দুনিয়ায়। বোকার মত কেউ একটা কিছু করে বসতে পারে, এই চিন্তা আমার মাথাতেও এসেছে। আমার দ্বিতীয় অনুরোধটা সেজন্যেই। এই এলাকায় সামরিক ঘাঁটি গিজ গিজ করছে। প্রেসিডিয়ো ছাড়াও রয়েছে ফোর্ট বেকার, ট্রেজার আইল্যান্ড, ফোর্টস ফান্সটন, ফোর্ট ব্যারি, ক্রংকাইট। বাই রোড এখান থেকে সবগুলোতেই সহজে পৌছানো যায়। যে-কোন একটা স্টেশন থেকে দুটো মোবাইল সেলফ-প্রপেল্ড র‍্যাপিড-ফায়ার অ্যান্টিএয়ার-ক্রাফট গান পাঠিয়ে দাও ব্রিজে। এক ঘণ্টার মধ্যে চাই আমি। তার আগে, আর্মিকে দিয়ে ওগুলো পরীক্ষা করিয়ে নেবে।'

'আপনি···আপনি উন্মাদ!'

'হয়তো, কিন্তু সাধু প্রকৃতির উন্মাদ। আমার অনুরোধ···'

'রক্ষা করা সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয়? জেনারেল পীল?'

সীট থেকে উঠে মারমুখো যোদ্ধার চেহারা নিয়ে এগিয়ে এলেন জেনারেল। ফোনের রিসিভার নিয়ে বললেন, 'এই উন্মাদ ভদ্রলোক যা বলেন শোনো। বুঝতে পারছ না উনি নিজেকে আমাদের সবার চেয়ে বড় করে দেখছেন?'

'আমাকে ভুল বুঝলেন, জেনারেল।' মুচকি হেসে রিসিভারটা নিল সে। 'কানে পানি গেছে, ডিকসন?'

'আর কি বলার আছে বলুন,' গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো পুলিস চীফের গলায় কেউ ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে।

'আমার তৃতীয় অনুরোধ। আর্মি ইঞ্জিনিয়ারদের দুটো স্কোয়াডকে ডেকে পাঠাও। আমি চাই ব্রিজের দুই মুখে দুটো স্টীল ব্যারিয়ার তৈরি হোক। যথেষ্ট শক্ত হতে হবে, যাতে একটা ট্যাংককে ঠেকিয়ে দিতে পারে। যথেষ্ট উঁচুও হতে হবে, যাতে কেউ টপকাবার চেষ্টা না করতে পারে—আর, হ্যাঁ, মাথার দিকে থাকতে হবে কাঁটাতারের বেড়া। উত্তর ব্যারিয়ারে কোন ফাঁক-ফোকর থাকতে পারবে না। দক্ষিণ ব্যারিয়ারের মাঝখানে একটা গেট থাকবে, যাতে একটা জীপ আসা-যাওয়া করতে পারে। এই গেট শুধু এক দিক থেকে খোলা যাবে—আমাদের দিক থেকে। কিভাবে কি করতে হবে, আমার বা তোমার চেয়ে আর্মি ইঞ্জিনিয়াররাই ভাল বলতে পারবে। কাজটায় যদি কোন খুঁত পাই আবার নতুন করে তৈরি করব আমি, মনে থাকে যেন কাজটা আমি নিজে তদারক করব।'

মনে হলো পুলিস চীফ শ্বাস কষ্টে ভুগছেন। অবশেষে তিনি জানতে চাইলেন, 'কেন?'

'প্যাসিফিক থেকে কুয়াশা আসছে। এই কুয়াশা নাকি প্রায়ই গোটা ব্রিজটাকে

ঢেকে ফেলে। এবারও যদি ফেলে, গা ঢাকা দিয়ে ব্রিজে চলে আসার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে তোমরা।'

'দক্ষিণ ব্যারিয়ারে গেট দরকার কেন?'

'আলোচনা করতে হলে প্রতিপক্ষ দরকার, তারা আসবে কিভাবে? ধরো, বাদশার গায়েই একটা গুলি লাগল, তখন ডাক্তার লাগবে না? তাছাড়া, গাড়ি করে শহরের সবচেয়ে ভাল খাবার-দাবারও ব্রিজে পাঠাবে তুমি···'

'জেসাস! কি আশ্চর্য নার্ভ আপনার!'

'এর মধ্যে নার্ভের কি দেখলে?' আহত হলো কবীর চৌধুরী। 'আমার সঙ্গী-সাথীরা যাতে পেটে খিদে নিয়ে কষ্ট না পায় সেটা তো আমাকেই দেখতে হবে। ব্যাপারটাকে মানবিক কোণ থেকে বিবেচনা করো, ডিকসন। বাদশা আর প্রেসিডেন্টরা খিদের জ্বালা অনুভব করতে অভ্যস্ত নয়। খেতে না পেয়ে ওরা যদি মারা যায়, ইতিহাস তোমার বিরুদ্ধে কি রায় দেবে সেটা একবার ভেবে দেখেছ?'

পুলিস চীফ চুপ করে থাকলেন।

বলে চলল কবীর চৌধুরী, 'রাজ-রাজড়াদের ব্যাপার, তাদের অসুবিধে-সুবিধে যেমন দেখতে হবে, তেমনি খেয়াল রাখতে হবে তাদের মান-সম্মান-ইজ্জতের দিকে। ব্যারিয়ার তৈরি হবার আগেই এক জোড়া মোবাইল ল্যাট্রিন ভ্যান পাঠিয়ে দাও। ইকুইপমেন্টগুলো অত্যন্ত উঁচু মানের হওয়া চাই। যে-কোন একটা কিছুর ওপর বসতে অভ্যস্ত নয় ওরা। উঁচু মানের ইকুইপমেন্ট বলতে আমি কিন্তু সশস্ত্র এফ. বি. আই. দেরকে বোঝাচ্ছি না। সব লিখে নিয়েছ, ডিকসন?'

'রেকর্ড হয়ে গেছে।'

'তাহলে ঝাঁপিয়ে পড়ো কাজে। নাকি আবার একবার জেনারেল পীলকে ডাকতে হবে?'

'যা যা চেয়েছেন, পাবেন সব।'

'সময় মত?'

'হ্যাঁ।'

হাঁটুর ওপর রিসিভার রেখে সেটার ওপর হাত বুলাতে বুলাতে এদিক ওদিক তাকাল কবীর চৌধুরী, সকৌতুকে বলল, 'আমার কপালে খারাবি আছে, শেষ পর্যন্ত আমি ধরা পড়ে যাব—আশ্চর্য! এ-ধরনের কোন কথাই বলল না পুলিস চীফ! আবার রিসিভার তুলল সে। 'শেষ অনুরোধ, ডিকসন। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের প্রেসিডেন্ট তো এখন গুড ফর নাথিং, তাঁর কথার কোন দাম দেব না আমি—প্রশ্ন হলো, একটা নেতাহীন জাতির কার সাথে কথা বলব আমি?'

'ভাইস-প্রেসিডেন্ট এরই মধ্যে শিকাগোয় পৌঁছে গেছেন। এই মুহূর্তে ও'হেয়ার এয়ারপোর্টের পথে রয়েছেন তিনি।'

'চমৎকার, চমৎকার! না চাইতেই সহযোগিতা! গুড, ভেরি গুড। কিন্তু, দু'একজন সিনিয়র মন্ত্রীরও সহযোগিতা চাইব আমি, ডিকসন। জানি, চাওয়াটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু···'

'আপনার বিনয় আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, মি. চৌধুরী।' সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল পুলিস চীফ। 'যা বলবার ভণিতা না করে বলুন।

আপনি নিশ্চয়ই মন্ত্রীদের নাম ভেবে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দু'জনের।'

'দু'জন মন্ত্রী আর ভাইস-প্রেসিডেন্টকে যদি ব্রিজে পাঠানো হয়, আপনি তাদেরকেও জিম্মি রাখবেন, তাই না?'

'বোকা নাকি! কিডন্যাপাররা মধ্যস্থতাকারীদের জিম্মি রাখে বলে শুনেছ কখনও?' উত্তরের অপেক্ষায় দু'সেকেন্ড বিরতি নিল কবীর চৌধুরী, কিন্তু পুলিস চীফ কথা বললেন না। 'সেক্রেটারি অভ স্টেটকে দরকার হবে আমার, ডিকসন।'

'তিনি রওনা হয়েছেন।'

'এ মাইন্ড-রিডার, নো লেস! কোত্থেকে?'

'লস এঞ্জেলস।'

'ওখানে কি করতে গিয়েছিল?'

'আই. এম. এফ. মীটিং।'

'তাই? তার মানে...'

'হ্যাঁ,' তিক্ত সুরে বললেন পুলিস চীফ। 'সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীও ছিলেন সেখানে। সেক্রেটারি অভ স্টেটের সাথেই আসছেন তিনি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল কবীর চৌধুরী। 'কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীর সাথে কবীর চৌধুরীর ফিস ফিস আলাপ! ইয়া পারওয়ারদেগার, এই দিনটির অপেক্ষাতেই ছিলাম!'

পাঁচ

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। চোখ মেলার সময় অনুভব করল, ভারী সীসা হয়ে আছে পাতা দুটো। মাথা ঝিম ঝিম করছে। কানেও যেন কম শুনছে একটু। তাছাড়া গ্যাসের আর কোন প্রভাব আছে বলে মনে হলো না। উঠে বসার আগে হাত দিয়ে আলতোভাবে জুলফি, ভুরু, চুল, চিবুক ইত্যাদি স্পর্শ করল ও। স্বস্তি বোধ করল, প্রদ্যুৎ মিত্রের চেহারা ঠিকই আছে।

ড্রাইভারের পায়ের কাছে বিস্ফোরণটা ঘটতে দেখেই ধরতে পেরেছিল রানা, ওটা গ্যাস বোমা। কিন্তু তারপর এত দ্রুত আক্রান্ত হলো, এক সেকেন্ড পরে কি ঘটেছে বলতে পারবে না।

চোখ থেকে ঝাপসা ভাব কেটে যেতে নড়েচড়ে বসল রানা। প্রথমেই চোখ পড়ল পাশের সীটে। ঝলমলে সোনালি চুলে ঢাকা পড়ে গেছে মেয়েটার মুখ। সীটের পিছন দিকে হেলে রয়েছে সে, চকমকে সবুজ সিল্ক দিয়ে ঢাকা বুক বেয়াড়া রকম বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। নিজের অজান্তে একটা ঢোক গিলল রানা। দু'বার চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েও হেরে গেল, তিন বারের বার বাধ্য করল নিজেকে।

এদিক ওদিক তাকাল রানা। সীট থেকে অনেকেই পড়ে গেছে মাঝখানের

প্যাসেজে। কেউ কেউ এখনও সীটের ওপর রয়েছে, কিন্তু হয় সামনের দিকে ঝুঁকে, নয় কাত হয়ে রয়েছে একপাশে। পুরোপুরি জ্ঞান এখনও ফিরে পায়নি কেউই, তবে দু'একজন এক-আধটু নড়াচড়া করছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। সানফ্রান্সিসকোয় এই প্রথম আসেনি ও, কাজেই গোল্ডেন গেট ব্রিজ চিনতে অসুবিধে হলো না। হাতঘড়ি দেখল ও। গ্যাস বোমা বিস্ফোরিত হবার পর এক ঘন্টার ওপর পেরিয়ে গেছে। অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল মনে।

ঘুরেফিরে আবার মেয়েটার দিকে চোখ পড়ল। দশ লাখে একটা, মুনি-ঋষিদেরও ধ্যান ভাঙবে। দেখতে ছোটখাট, কাঁধে ঝোলানো ভারী সিনে ক্যামেরাটা যে কিভাবে বয়ে বেড়ায় আল্লাই মালুম। ওকে আভাসে বলেছে, বড় একটা টিভি কোম্পানীর ফ্যাশন ফটোগ্রাফার সে। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় না গিয়ে ফটোগ্রাফার হয়ে প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রায় কেন এসেছে, সেটা একটা বিরাট রহস্য। নাম বলেছে, জুলি।

জুলির কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। অমনি খপ্ করে ওর হাতটা খামচে ধরল জুলি।

'আরে, তুমি জেগে আছ!'

ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল জুলি। চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক তাকাল। 'ও-ওরা আ-আছে এখনও?'

'কারা?'

'যারা বোমা না কি যেন···'

'আর কি জানো তুমি?'

'আওয়াজ শুনলাম, ধোঁয়া দেখলাম, তারপর আর কিছু মনে নেই।' ভয়ে ভয়ে আবার চারদিকে তাকাল জুলি। 'আসলে কি ঘটেছে?'

উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি সুস্থ বোধ করছ তো?'

'এক ফোঁটা মদ ছুঁইনি অথচ মাতাল লাগছে। প্রদ্যুৎ?'

'বলো।'

'আসলে কি ঘটেছে?'

'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। গোল্ডেন গেট ব্রিজে আমরা আটকে আছি কেন?'

'সে কি!'

'জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও।'

তাকাল জুলি। তারপর হঠাৎ সীটের ওপর ঘুরে বসে রানার কাঁধ খামচে ধরল। 'আমার ভয় করছে!' তার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্যাসেজে পড়ে থাকা দু'জন লোকের দিকে তাকাল রানা। 'ওদের···ওদের হাতে হাতকড়া কেন, প্রদ্যুৎ? এসবের মানে কি?'

'হুঁ,' গম্ভীর হলো রানা। 'তাই তো!'

'কেন?' আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জুলি।

'জানি না। এইমাত্র জাগলাম আমি। তবে জানব।'

'ওদের হাতে হাতকড়া রয়েছে, তাহলে আমাদের হাতে নেই কেন?'

'আমাদেরকে হয়তো গোণার মধ্যে ধরেনি, তাই। সেটাই ওদের কাল হবে।' ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। দেখল, ঠিক পিছনেই রয়েছে প্রেসিডেনশিয়াল কোচ। জুলির হাত দুটো কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল ও। 'একজন সাংবাদিককে তার দায়িত্ব পালন করতে দাও। আমি যাচ্ছি।'

সীট ছেড়ে উঠতে যাবে রানা, ওর কোমর দু'হাতে জড়িয়ে ধরল জুলি। 'আমিও যাব তোমার সাথে।'

'ঠিক আছে, চলো। কিন্তু তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত, জুলি।'

সরল, নিরীহ চোখ তুলে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জুলি।

'একটু পরপরই যদি এভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরতে থাকো, তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি কোন গ্যারান্টি দিতে পারব না। নাকি জানো না, ভারতীয়রাও রক্ত-মাংসের মানুষ?'

চেহারা একটু লালচে হলো জুলির। 'দুঃখিত, প্রদ্যুৎ। কি জানো, ভয় পেলে আমার হুঁশ-জ্ঞান থাকে না।'

'আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। 'চলো। লেডিস ফার্স্ট।'

সীট থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল জুলি। তার পিছু নিল রানা, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে কাছের ঘুমন্ত লোকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার কোটের খানিকটা সরিয়ে ভেতরে তাকাল ও। একটা হোলস্টার রয়েছে, কিন্তু খালি। সিধে হয়ে এগোল আবার। সামনের দরজার কাছে পৌঁছে লক্ষ করল, সীট থেকে পড়ে গেছে ড্রাইভার, এখনও ঘুমাচ্ছে। ঠিক সীটের পাশে নয়, বেশ খানিক দূরে সরে রয়েছে লোকটা। বোঝাই যায়, কেউ তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

কোচ থেকে নেমে এসে ব্রিজের ওপর জুলির পাশে দাঁড়াল রানা। ভালুক আকৃতির, নিগ্রো চার্লিকে দেখল ওরা, ওদের দিকে মেশিন-পিস্তল তাক করে আছে। একজন পুলিস কোন কারণ ছাড়াই বন্দুক তাক করবে, এটা যথেষ্ট বিস্ময়কর একটা ব্যাপার। কিন্তু তারচেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার, একজন পুলিসের হাতে মেশিনগান থাকা। অবাক হওয়ার মত আরও দৃশ্য চোখের সামনেই রয়েছে। ছয়জন পুলিসকে দেখল ওরা। তিন জোড়া হাতকড়া দিয়ে ছয়জনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

রানার কব্জি খামচে ধরল জুলি। ব্যথা পেয়ে উহ্ করে উঠল রানা।

'ভয় পেয়ো না,' বলল রানা। 'এসবের নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা আছে।'

'আছে বৈকি!' বলল কবীর চৌধুরী। তার মুখে সরল হাসি, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের সামনে থেকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'আপনার নাম?'

কবীর চৌধুরীকে দেখে চমকে উঠল রানা। কয়েক সেকেন্ড নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেল ও। তারপর তাড়াতাড়ি বলল, 'প্রদ্যুৎ মিত্র।'

ঘন ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে কবীর চৌধুরী জানতে চাইল, 'দেশ?'

'ভারত।'

'আচ্ছা!' ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে কি বোঝাতে চাইল কবীর চৌধুরী, সে-ই জানে। 'ইন্দিরা গান্ধী গরু জবাই বন্ধ করতে বলেছে, কথাটা কি সত্যি?'

'সত্যি।'
'আপনি নিশ্চয়ই এর কারণ বা ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করতে পারবেন না?'
'দুঃখিত,' বলল রানা। 'দেশীয় রাজনীতি আমার বিষয় নয়।'
'নামটা আরেকবার, প্লীজ?'
'প্রদ্যুৎ মিত্র।'
'কেমন যেন খটমটে লাগে। ছোট করে নিলে আপত্তি নেই তো? প্রদ্যুৎ-এর শেষ অংশটুকু থাক? দ্যুত? বাহ্, চমৎকার! দ্যুত! দূত মানে এক হিসেবে চর-ও। আপনি কি একজন গুপ্তচর, মি. দ্যুত?'
জোর করে হাসল রানা। কবীর চৌধুরী কি তার সাথে ঠাট্টা করছে? ওর পরিচয় জানে, কিন্তু ভান করছে জানে না? বলল, 'কিন্তু আপনার সম্পর্কে এখনও তো কিছু জানা হলো না।'
'একসাথে যখন হয়েছি, জানবেন বৈকি। তার আগে, এই অসুবিধের জন্য, আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। এই মেয়ে, এই অল্প বয়সে তুমি রিপোর্টার?'
'হেলিকপ্টার!' ফিসফিস করে বলল জুলি। কবীর চৌধুরীর কথা শুনতে পায়নি সে।
তার দৃষ্টি অনুসরণ করে হেলিকপ্টারের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'হ্যাঁ, তাই। সবই ব্যাখ্যা করা হবে, তবে এখুনি নয়। সাংবাদিকরা সবাই ঘুম থেকে উঠে এক জায়গায় জড় হোক, তখন।' রিয়্যার কোচের দিকে এগোল সে। হাসিটি লেগেই আছে মুখে। ঘন কুয়াশার দিকে তাকাল একবার। পশ্চিম দিক থেকে ধীরে ধীরে, খুবই শ্লথ গতিতে এগিয়ে আসছে। এই কুয়াশা তার মনে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকলেও চেহারা দেখে তা বোঝা গেল না। নাক ভাঙা পুলিস কারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধুরা কি স্বপ্নের দেশ থেকে ফিরেছে, বেডলার?'
'জ্বী, স্যার। কিন্তু তারা সবাই মনমরা, স্যার।' একহারা, তীক্ষ্ণ চেহারা বেডলারের, চোখ-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, হাতে একটা ব্রিফকেস ধরিয়ে দিলেই তাকে উঠতি আইন ব্যবসায়ী মনে না করে পারা যাবে না। সে যে শুধু টেলিকমিউনিকেশন এক্সপার্ট তাই নয়, কমবিনেশন লক খুলতেও ওস্তাদ। তাছাড়া, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে লোকজনকে ভয় দেখাতেও কম পটু নয়।
'গাড়ির ভেতরেই থাকুক ওরা। বাইরে বের করে এনে হাতকড়া পরানো ঝামেলার ব্যাপার।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল কবীর চৌধুরী। 'পুলিস আর এফ. বি. আই. মিলে আমাদের হাতে রয়েছে ষোলো জন। লীড কোচে চারজনের কাছে রিভলভার পাওয়া গেছে, ওদেরকে এফ. বি. আই. বলে ধরে নিচ্ছি। সামনের দিকে রয়েছে ছয়জন পুলিস, এখানে রয়েছে চারজন, আর আমাদের কোচে রয়েছে দু'জন। এদের সবাইকে এক জায়গায় জড় করবে, তারপর দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি একা পারবে না, সঙ্গে আরও দু'জনকে নিয়ো। এই ষোলোজনের একজনও যদি এখানে থাকে, নিজেদের আমরা বিপদমুক্ত বলে মনে করতে পারি না। ব্রিজের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে যে ক'টা হাতকড়া পাও খুলে নেবে।'

'খুলে নেব, স্যার?'
'নিশ্চয়ই নেবে। হাতকড়া খুব কাজের জিনিস, বেডলার। আবার ওগুলো কখন দরকার লাগে কেউ বলতে পারে না। তারপর কি করবে? ওদেরকে বলবে, পায়ে হেঁটে ব্রিজ থেকে নেমে যাও। বুঝেছ?'
'জ্বী, স্যার। আপদ বিদায় করে দেব।' পশ্চিম দিকে একটা হাত তুলল বেডলার। 'ওদিকটা দেখেছেন, স্যার?'
'হ্যাঁ,' চেহারা গম্ভীর হলো কবীর চৌধুরীর। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'প্রকৃতি বরাবরই আমার ওপর বিরূপ। কিন্তু এবার সুবিধে করতে পারবে না। আসছে আসুক, দেখা যাবে কি করা যায়। আমার তো মনে হয়, ব্রিজের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যাবে...'
'মি. চৌধুরী!' গলাটা রোজেনের, রিয়্যার কোচের সামনের দরজা থেকে ঘন ঘন হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। 'মাউন্ট টামালপাইজ। আর্জেন্ট!'
হন হন করে এগোল কবীর চৌধুরী। রিয়্যার কোচে উঠে কনসোলের সামনে বসল। তুলে নিল মাইক্রোফোন। 'চৌধুরী।'
'রজার হীল, স্যার। রাডারে আমরা একটা ব্লিপ পাচ্ছি, স্যার। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে, একটু পুব দিক ঘেঁষে। সম্ভবত হালকা কোন প্লেন, স্যার। মাইল আটেক দূরে।'
আরেকটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পুব। তার মানে সান ফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। 'পুলিস চীফ ডিকসনকে চাই আমি। এই মুহূর্তে।'
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাইনে এলেন ডিকসন। 'আবার কি!'
'তোমাকে আমি আকাশ খালি রাখতে বলিনি? আমাদের রাডারে একটা ব্লিপ ধরা পড়েছে, এয়ারপোর্টের দিকে...'
ডিকসন বাধা দিলেন, 'জ্যাক কলভিন আর ডেভিড নিউসমের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন আপনি, নাকি চাননি? সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী। লস এঞ্জেলস থেকে পনেরো মিনিট আগে পৌঁচেছেন ওঁরা, এখন সরাসরি হেলিকপ্টারে চড়ে আসছেন...'
'কোথায় ল্যান্ড করবে?'
'প্রেসিডিয়ো-র মিলিটারি রিজার্ভেশনে। গাড়িতে দু'মিনিটের পথ।'
'ধন্যবাদ।' বোতাম টিপে মাউন্ট টামালপাইজের সাথে যোগাযোগ করল কবীর চৌধুরী। 'ওরা বন্ধু। তবে স্ক্যানারে চোখ রাখো, পরের বার বন্ধু নাও হতে পারে।'
সীট ছেড়ে কোচ থেকে নামতে যাবে কবীর চৌধুরী, চোখ পড়ল প্যাসেজে পড়ে থাকা লোকটার দিকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এফ. বি. আই.-এর ডেপুটি ডিরেক্টর, তার পরিচয় এবং চেহারা নিয়ে রয়েছে ব্যারি রোজেন। রোজেনের দিকে ফিরল সে, বলল, 'এখন থেকে আবার তুমি নিজেকে জন কনওয়ে ভাবতে পারো। রোজেনের হাত-পা খুলে দাও।'
'স্যার কি চান ওকে আমরা ব্রিজ থেকে নদীতে ফেলে দিই?' আগ্রহের সাথে

জানতে চাইল কনওয়ে।

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল কবীর চৌধুরী। এই ইতস্তত ভাবটা তার নিজের কাছেই ভাল ঠেকল না। দ্বিধা তার প্রকৃতির মধ্যে একেবারেই নেই। বুদ্ধি বা উপস্থিত বুদ্ধি যার সাহায্যেই সিদ্ধান্ত নিক, সেটা তৎক্ষণাৎ নেয়। জীবনে দু'চারটে ভুল যা হয়েছে এই ইতস্তত করার জন্যে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, এই নীতিতে বিশ্বাসী সে। কিন্তু মস্কোর শর্ত ভুলে থাকতে চাইলেও তা সম্ভব নয়। তাছাড়া, আরও অনেক দিক বিবেচনা করার আছে। বলল, 'না, ওকে আমরা রাখব। কিভাবে এখনও তা জানি না, তবে কোন একটা কাজে লেগেও যেতে পারে লোকটা। হাজার হোক, এফ. বি. আই.-এর ডেপুটি ডিরেক্টর। কথা না শুনলে পরিণতি কি হবে, জানিয়ে দাও। তবে আমি নতুন করে কিছু না বললে এখানেই রাখো ওকে।'

ব্রিজে নেমে এসে লীড কোচের দিকে এগোল সে। কাছে গিয়ে দেখল, কোচের সামনে এক লাইনে অনেকগুলো লোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছে চার্লি আর তার দুই সঙ্গী। সবগুলো লোকের মুখ ঝুলে পড়েছে, চেহারায় হতভম্ব ভাব। এদের সাথে চারজন হাতকড়া পরা লোককেও দেখল সে। উঁকি দিয়ে কোচের ভেতরে তাকাল, ফাঁকা। ফিরল হুয়ানের দিকে। 'এখানে যারা হাতকড়া পরে রয়েছে আর ছয়জন পুলিস, ওদেরকে বেডলারের কাছে নিয়ে যাও। ও জানে কি করতে হবে।'

পশ্চিমে ফিরে ঘন কুয়াশার দিকে তাকাল সে। দূর থাকতে মনে হয়েছিল, ধীরে ধীরে আসছে। এখন অনেক কাছে চলে এসেছে, এগোবার গতিও খুব দ্রুত বলে মনে হলো। তবে, ঝোঁকটা যেন নিচের দিকে নামার। ভাগ্য সহায়তা করলে ব্রিজের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যাবারই সম্ভাবনা। আর তা যদি নাও যায়, প্রেসিডেন্ট আর তার মেহমানদের কান কেটে নেয়ার হুমকি দিয়ে বিপদ থেকে পার পাবার ব্যবস্থা করা যাবে। তবু ব্রিজের দু'দিকে স্টীল ব্যারিয়ার তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই কুয়াশা ভয়ানক একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রিপোর্টারদের দিকে তাকাল সে। ওদের সাথে চারজন মেয়ে সাংবাদিকও রয়েছে। তিনজনকে তার হাফ-বুড়ি বলে মনে হলো। বাকি একজন, ভারতীয় সাংবাদিক প্রদ্যুৎ মিত্রের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, কিশোরী বললেই হয়। 'আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, প্লীজ,' তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। 'কেউ একটা ফুলের টোকাও দেবে না আপনাদের। আমি…'

একজন রিপোর্টার ভিড় ঠেলে এক পা এগিয়ে এল, বাধা দিয়ে বলল, 'আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে…'

ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গিতে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'পরে। আমার বলার কথা শেষ হলে, আপনাদের সবাইকে একটা সুযোগ দেয়া হবে—যার ইচ্ছে চলে যাবেন, যার খুশি থাকবেন। যারা থাকবেন, তাদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে না।' নিঃশব্দ হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'আমি জানি আপনারা বেশিরভাগই থাকার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবেন। কারণ, এরই মধ্যে আপনারা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন, এ-ধরনের স্টোরি বা নিউজ হপ্তায় হপ্তায় আকাশ থেকে পড়ে না।'

কবীর চৌধুরী কথা বলছে, রিপোর্টাররা খস খস করে লিখে নিচ্ছে সব। ফটো তুলতে হঠাৎ করে সাহস পেল না কেউ, কিন্তু একজন ফটোগ্রাফার ক্যামেরা তুলে ক্লিক করতেই বাকি সবাই ব্যস্ত-পাগল হয়ে উঠল। ফটোগ্রাফাররা ছুটোছুটি করে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে একের পর এক ছবি তুলে চলল। সত্যি কথা বলতে কি, প্রতি হপ্তায় কেন, সারাজীবনে একবারও এই রকম দুনিয়া কাঁপানো স্টোরি রিপোর্টারদের জোটে না কপালে। গোল্ডেন গেট ব্রিজ থেকে ওদেরকে সরাতে হলে গলা ধাক্কা দিতে হবে, স্বেচ্ছায় কেউ যাবে বলে মনে হয় না।

ব্রিজে পৌঁছে গেছে কুয়াশা, কিন্তু ঢেকে ফেলেনি। ওপরের পাতলা, হালকা ঝুঁটি ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে ব্রিজের ওপর দিয়ে, মাঝখানের ঘন শরীরটা এগোচ্ছে ব্রিজের বিশ ফিট নিচ দিয়ে। টাওয়ারগুলোর নিচের অংশ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে, ঢাকা পড়ে গেছে নদী। মনে হলো, শূন্যে ভাসছে ব্রিজ। ওজনহীন একটা অনুভূতি হলো সবার।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলল কবীর চৌধুরী। সবাই যখন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিছু কিছু আইন শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে সবাইকে রিয়্যার কোচে তিনটে টেলিফোন আছে, শহরের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। এগুলো কবীর চৌধুরীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে, তবে রিপোর্টাররাও মাত্র একবার করে কাজে লাগাতে পারবে। কি কাজে লাগাতে পারবে, তাও বলে দেয়া হলো। ফটোগ্রাফিক সার্ভিস, নিউজপেপার, ওয়্যার সার্ভিস অথবা নিউজ এজেন্সীর সাথে যোগাযোগ করা যাবে। যোগাযোগ করে একজন লোককে ব্রিজের দক্ষিণ মুখে আসতে বলতে হবে। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার সেই লোকের হাতে ডিসপ্যাচ অথবা ফটোগ্রাফ পাঠাতে পারবে। এগুলো দিনে তিনবার পাঠাবার সুযোগ দেয়া হবে, নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা হবে পরে।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচের চারদিকে মার্কার বসানো হবে, অনুমতি ছাড়া সেই মার্কার টপকে কেউ ভেতরে যেতে পারবে না। কবীর চৌধুরী বা তার দলের লোকদের অনুমতি ছাড়া কোন রিপোর্টার প্রেসিডেনশিয়াল কোচের কারও সাক্ষাৎকার নিতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট যদি একটা প্রেস-কনফারেন্স ডাকেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়, কিন্তু সেটা নির্ভর করবে প্রেসিডেন্টের মর্জির ওপর। কবীর চৌধুরী তাঁকে তো আর বাধ্য করতে পারেন না!

হেলিকপ্টার দুটোর চারদিকেও দাগ দেয়া হবে, সেই দাগ টপকেও ভেতরে ঢুকতে পারবে না কেউ। কবীর চৌধুরীর কোচের কাছ থেকে বিশ গজ দক্ষিণে একটা, আর রিপোর্টাররা এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বিশ গজ দূরে আরেকটা, এই মোট দুটো সাদা রেখা আঁকা হবে ব্রিজের ওপর। এই চল্লিশ গজের মধ্যে থাকতে হবে সবাইকে। রেখা দুটোর পাঁচ গজ সামনে হাতে মেশিন-পিস্তল নিয়ে একজন করে গার্ড থাকবে। কেউ রেখা টপকালে সাবধান করবে না গার্ড, সরাসরি গুলি করবে।

সন্ধের পর রিপোর্টাররা তাদের কোচে থাকবে, সকাল না হওয়া পর্যন্ত। এই সব নিয়ম শিথিল করা হবে শুধু যদি খবর হওয়ার যোগ্য কোন ঘটনা ঘটে, তবেই। ঘটনাটা খবর হওয়ার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করবে কবীর চৌধুরী। সবশেষে বলল

সে, 'এসব নিয়ম কেউ যদি মেনে চলতে না চায়, ব্রিজ থেকে এখুনি চলে যেতে পারে সে।'

কেউ গেল না।

'কোন প্রশ্ন?' রিপোর্টাররা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে। এই ফাঁকে পুব দিকে ফিরে কুয়াশার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। পুব দিকের আলক্যাটরাজ দ্বীপ ঢাকা পড়ে গেছে।

ভিড় ঠেলে সামনে বাড়ল দু'জন। দু'জনেই মাঝ বয়েসী, পরনে দামী কনজারভেটিভ স্যুট। একজনের মাথায় চকচকে টাক, আরেকজনের রয়েছে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

ফ্রেঞ্চকাট বলল, 'আছে।'

'আপনাদের পরিচয়?'

'আমি বিল গাইডেন—এ. পি.। উনি রিচ লোগান—রয়টার।'

কবীর চৌধুরীর চেহারায় আগ্রহ ফুটে উঠল। উপস্থিত রিপোর্টাররা সবাই মিলে দুনিয়ার যে ক'টা কাগজে খবর পৌঁছাতে পারবে, ওরা দু'জনেই তারচেয়ে বেশি কাগজে পাঠাতে পারবে। 'বলুন?'

'মি. চৌধুরী, আপনি নিশ্চয়ই আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাবেননি যে বাহ্, সকালটা তো সুন্দর, আজই তাহলে প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করা যাক?'

'না, তা ভাবিনি।'

রিচ লোগান বলল, 'অপারেশনের প্রকৃতি দেখেই বোঝা যায়, প্ল্যানটা তৈরি করতে যথেষ্ট সময় আর পরিশ্রম লেগেছে। প্ল্যান তৈরি করার সময় সব দিক বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়েছিল। কি কি ঘটতে পারে, সব আগে থাকতেই আন্দাজ করে নেয়া হয়েছিল। আপনি নিজেই কি এই প্ল্যান তৈরি করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তৈরি করতে কত দিন সময় লেগেছে?'

'তিন মাস।'

'তা সম্ভব নয়। এই মোটর শোভাযাত্রার রুট, সময় ইত্যাদি মাত্র চারদিন আগে ঠিক করা হয়েছে।'

'রুট, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ওয়াশিংটনে তিন মাস আগে।'

গাইডেন বলল, 'আমাদের সামনে যে-সব প্রমাণ রয়েছে, তাতে আপনার কথাই বিশ্বাস করতে হয়। আমার প্রশ্ন, তিন মাস আগেই যদি সব ঠিক করা হয়ে থাকে, এত দিন তা চেপে রাখা হয়েছে কেন?'

'যাতে আমার মত লোকেরা কোন সুযোগ নিতে না পারে।'

'এই তথ্য আপনি যোগাড় করলেন কিভাবে?'

'কিনেছি।'

'কিভাবে? কার কাছ থেকে?'

'দুনিয়ার আর সব শহরের মতই ওয়াশিংটনেও ত্রিশ হাজার ডলারে অনেক তথ্য কিনতে পাওয়া যায়।'

'কার কাছ থেকে কিনেছেন, নাম বলবেন কি?'

'বোকার মত কথা বললেন। আর কোন প্রশ্ন আছে?'

প্রৌঢ়া একজন বলল, 'আছে। আপনার এই অপারেশনে কোন খুঁত নেই দেখে বুঝতে পারছি, আপনি এ-ধরনের ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট। যদি বিশ্বাস করি, আইনের বাইরে এটা আপনার প্রথম পদক্ষেপ নয়, তাহলে কি ভুল হবে?'

'আজ জানলাম, সাংবাদিকরাও অশিক্ষিত হয়,' অপমান করছে কবীর চৌধুরী, কিন্তু মিষ্টি হেসে। 'এর আগের প্রেসিডেন্টের মাকে আইফেল টাওয়ারে কে আটকেছিল? এয়ারফোর্স ওয়ান কে হাইজ্যাক করেছিল? তারপর...'

'মাই গড!' মহিলা আঁতকে উঠল। 'সেই চৌধুরী আর কবীর চৌধুরী, আপনারা তাহলে একজনই?'

'আর কিছু?'

'অবশ্যই,' বলল গাইডেন। 'আমরা সবাই যেটা জানতে চাই—কেন?'

'দু'ঘণ্টার মধ্যে প্রেস-কনফারেন্স ডাকছি, তখন বলব। সবচেয়ে বড় টিভি কোম্পানিগুলোর লোকজন থাকবে, টিভি ক্যামেরা থাকবে। সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী, এদেরকেও দেখতে পাবেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেভিড ল্যাংফোর্ডকেও আমরা আনাচ্ছি, তবে কনফারেন্সের আগে তিনি পৌঁছুতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

এরা সবাই ঝানু রিপোর্টার, প্রত্যেকের ঝুলিতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঠাসা, কিন্তু কবীর চৌধুরীর কথা শুনে তারা সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলল। অবশেষে গাইডেন সতর্কতার সাথে জিজ্ঞেস করল, 'মি. চৌধুরী, আপনার চোখে...'

'বিশেষ ধরনের চশমা,' এক চিলতে হাসি ফুটল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে। 'এর বদৌলতে শুধু সামনে নয়, পিছনটাও দেখতে পাই আমি। এখন আপনারা আমার কোচে টেলিফোন করতে যেতে পারেন। একেকবারে তিনজন করে।'

ঘুরে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। এগোল প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দিকে। মাত্র দু'পা এগিয়েছে, চার্লির আর্তনাদ শুনে চমকে উঠল সে।

'স্যার! বিপদ!' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে চার্লি, কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে চোখ জোড়া, তাকিয়ে আছে পশ্চিম দিকে।

কদাকার ভালুকের দৃষ্টি অনুসরণ করে পশ্চিম দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। পরমুহূর্তে কঠিন দেখাল তাকে। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে ব্রিজের ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের সামনে চলে এল সে। হাত দুটো নিজের অজান্তেই উঠে এল কোমরে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। এখনও কুয়াশা রয়েছে পশ্চিম দিকে, কিন্তু আধ মাইলটাক পর হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে সেটার বিস্তার। ওখান থেকে আরও প্রায় মাইলখানেক সামনে একটা জাহাজের সুপারস্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে। কুয়াশার নিচের অংশ জাহাজটার খোল আড়াল করে রাখলেও, জাহাজটা কি ধরনের বুঝতে অসুবিধে হলো না। মাথার উস্ক খুস্ক চুলে আঙুল চালাল কবীর চৌধুরী। যুদ্ধজাহাজ! ওরা যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে!

পাঁচ সেকেন্ড নড়ল না কবীর চৌধুরী, তারপরই তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। ছুটে প্রেসিডেনশিয়াল কোচে উঠল সে। কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে

প্যাসেজ ধরে দমকা বাতাসের মত এগোল। বজ্রকণ্ঠে ডানকানকে বলল, 'ডিকসন! তাকে না পেলে তার বাপকে কবর থেকে টেনে তুলতে বলো। ডাবল কুইক!' হাত বাড়িয়ে একটা টেলিফোন দেখাল। 'ওটা।'

প্রেসিডেন্ট, বাদশা এবং প্রিন্স পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। কোচের ভেতর শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। সাথে সাথে লাইনে এলেন পুলিস চীফ।

'ডিকসন? তোমার জন্যে একটা খবর আছে। আমি প্রেসিডেন্টের কান কাটতে যাচ্ছি।'

'স্যার!' সম্বোধনটা পুলিস চীফের মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল। 'কি বলছেন?'

'তোমার মুণ্ডু বলছি! ওখানে ওটা কি, কাগজের নৌকো? ফিরিয়ে নাও!'

'ফর গডস সেক, কি ফিরিয়ে নেব?'

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কবীর চৌধুরী, 'গোল্ডেন গেট ব্রিজের দিকে বড় একটা জাহাজ আসছে। ওটা আসুক আমি চাই না। যে বুদ্ধিই করে থাকো, পরিণতি শুভ হবে না। ফিরিয়ে নাও!'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু ধরুন।' লাইন চুপচাপ হয়ে গেল। এই সুযোগে হাত-ইশারায় পেরটকে কাছে ডাকল কবীর চৌধুরী।

'ব্রিজের দিকে একটা যুদ্ধজাহাজ আসছে। বিপদ? আমি জানি না। সবাইকে আড়ালে থাকতে হবে। কাগজের লোকেরা তাদের কোচে, আমাদের লোকেরা আমাদের কোচে। সবক'টা দরজা বন্ধ। তারপর আমার কাছে ফিরে এসো।'

ড্রাইভারের সীটের পাশে লালচুলো এক যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে, বেল্টে আটকানো রিভলভারের ওপর হাত, তার দিকে কবীর চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পেরট জানতে চাইল, 'টেডি একা সামলাতে পারবে, চীফ?'

নিজের রিভলভারটা টেনে বের করে টেলিফোনের পাশে রাখল কবীর চৌধুরী। 'এখানে আমিও রয়েছি। কুইক!'

ছুটে বেরিয়ে গেল পেরট।

আবার লাইনে এলেন ডিকসন। 'ওটা যুদ্ধজাহাজ ইউ.এস. এস. নিউ জার্সি। বছরের কয়েক মাস সান ফ্রান্সিসকো ওটার হোম বেস। ফুয়েল আর রসদ নেয়ার জন্যে এটা তার একটা ধরাবাঁধা ফেরা। ঠিক এই বিশেষ সময়টাতে তার আসার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু ভাটার সময় ব্রিজের তলা দিয়ে আসতে পারে।'

কবীর চৌধুরী ধারণা করল, ডিকসন সত্যি কথাই বলছে। ভাটা চলছে, সন্দেহ নেই। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষ একটা যুদ্ধজাহাজের সাহায্য পেতে পারে না—দু'ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে অসম্ভব। তারপর, যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে কি ফায়দা হবে বলে আশা করতে পারে ওরা? ব্রিজ উড়িয়ে দিতে পারবে না, প্রেসিডেন্ট রয়েছে। তবু, কার মনে কি আছে কিছুই বলা যায় না, সময় থাকতে সাবধান হওয়াই ভাল। বলল, 'থামাও ওটাকে। ব্রিজের নিচে কোনমতেই আসতে পারবে না। তেলী বন্ধুদের একজনকে ব্রিজ থেকে নিচে ফেলে দিই, এটা নিশ্চয়ই চাও না?'

'ফর গডস সেক, আপনি বদ্ধ, বদ্ধ, বদ্ধ একটা উন্মাদ!'

একটু স্বস্তি বোধ করল কবীর চৌধুরী।

রাগ নয়, পুলিস চীফের গলার সুরে কান্না আর আতঙ্কের মাঝামাঝি একটা ভাব

প্রকাশ পেতে শুনল সে। 'কাজেই তোমার সাবধান হওয়া উচিত। নয় কি?'
'দ্য নিউ জার্সির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি আমরা। আপনার চোদ্দ-পুরুষের দোহাই, হুট করে কিছু একটা করে বসবেন না।'

ছয়

নিজেদের পরিচয়, দায়িত্ব এবং ভূমিকা ভুলে ব্রিজের পশ্চিম পাশে ভিড় জমিয়েছে গার্ড আর রিপোর্টাররা, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে সবাই যুদ্ধজাহাজের দিকে। সহজ সরল যুক্তিই বলে দেয় ব্রিজের নিচ দিয়ে যুদ্ধজাহাজ গেলেও বিপদের কোন আশঙ্কা নেই, তবু দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা আর উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। যতই কাছে চলে আসছে জাহাজটা, ততই আকাশচুম্বি হয়ে উঠছে তার সুপারস্ট্রাকচার। সবাই জানে এর আগেও গোল্ডেন গেট ব্রিজের নিচ দিয়ে 'দ্য নিউ জার্সি' যাওয়া-আসা করেছে, তবু জাহাজটার সুপারস্ট্রাকচারটাকে ধীরে ধীরে আরও উঁচু হয়ে উঠতে দেখে দর্শকদের মনে অকারণ একটা ভয় আসন গেড়ে বসল—মনে হচ্ছে ডগাটা ব্রিজের সাথে ধাক্কা না খেয়ে পারে না

ব্যতিক্রম একজনকে পাওয়া গেল, যাকে দেখে মনে হলো এত বড় একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে অথচ সে-ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই। সামনের কোচে একা রয়েছে রানা, হাতে সবুজ কর্ড আর কালো একটা সিলিন্ডার। বেশ লম্বা একটা কর্ড, কিন্তু সুতোর মতই সরু। এক ইঞ্চি ডায়ামিটারের সিলিন্ডার, আট ইঞ্চি লম্বা। সিলিন্ডারের গায়ে খানিকটা কর্ড পেঁচিয়ে ওর বুশ জ্যাকেটের পকেটে কর্ড আর সিলিন্ডারটা রেখে দিল। তারপর কোচ থেকে ব্রিজে নেমে এল ও।

জাহাজের সুপারস্ট্রাকচার আরও কাছে চলে এসেছে, সেদিকে মাত্র একবার উদাস চোখে তাকাল রানা, তারপর অলস পায়ে এদিক ওদিক খানিক হাঁটাহাঁটি করে বাঁক ঘুরে কোচের ডান দিকে চলে এল। বাঁকটা ঘোরার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখল, ব্রিজের দূর প্রান্তে, যেখানে দর্শকদের ভিড় জমে উঠেছে, সেদিকে হন হন করে এগোচ্ছে রস পেরট। পেরটের উদ্দেশ্য কি জানার উপায় নেই, কিন্তু সে যে জরুরী কোন কাজে যাচ্ছে সেটা বোঝা গেল। রানা আন্দাজ করল, সময় খুব বেশি পাওয়া যাবে না। কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে।

সময় বাঁচাবার জন্যে ইচ্ছে হলো দৌড় দেয়, কিন্তু তাতে শুধু দৃষ্টিই আকর্ষণ করা হবে। কাছেপিঠে কাউকে দেখা গেল না, কোন ঘটনা ছাড়াই ব্রিজের পুব দিকে পৌঁছতে পারল রানা। চট করে নিজের তিন দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে পকেট থেকে কর্ড পেঁচানো সিলিন্ডারটা বের করল ও। ঝুঁকে পড়ল ব্রিজের কিনারা থেকে নিচের দিকে। তারপর সিলিন্ডারটা ছেড়ে দিল। কর্ডের প্যাঁচ ছাড়াতে ছাড়াতে নিচের দিকে কয়েক শো ফিট নেমে গেল সিলিন্ডার। কর্ডটা ছিঁড়ে একটা প্রান্ত লোহার বারে বেঁধে ঘুরে দাঁড়াল ও। কাঁধ দুলিয়ে, চুটকি বাজিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে একটা জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ফিরে এল কোচে। নিজের সীটে

বসে জুলির ক্যারি-অন খুলল ও। ঝুলন্ত কর্ডটা যদি কারও চোখে পড়ে যায়, এবং তারপর রিপোর্টারদের জিনিস-পত্র যদি সার্চ করা হয়, রানা চায় তখন যেন ওর নিজের জিনিস-পত্রের ভেতর সবুজ কর্ডটা না পায় ওরা। জুলির ক্যারি-অনে পাওয়া গেলে জুলির কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। নিউ জার্সিকে প্রথম দেখতে পাওয়ার সময় থেকে ব্রিজের পশ্চিম দিকে, বহু লোকের চোখের সামনে রয়েছে সে, তাকে সন্দেহ করার কোন কারণ থাকবে না। তবু যদি জুলির কোন বিপদ হয়, তখন দেখা যাবে। আপাতত নিজেকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে হবে ওর।

'বিশ্বাস করুন,' বললেন পুলিস চীফ, 'নিউ জার্সির ক্যাপটেন ঘটনাটা সম্পর্কে কিছুই শোনেননি। শুনেও বিশ্বাস করছেন না। তাঁর ধারণা, আমরা ঠাট্টা করছি। তাঁকে দোষ দিতে পারেন না। গত চল্লিশ বছর ধরে যেমন দেখে আসছেন, আজও তেমনি গোল্ডেন গেট ব্রিজকে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছেন তিনি। আপনিই বলুন, কি দেখে তাঁর বিশ্বাস হবে?'

পুলিস চীফের কথায় ঝর ঝর করে আবেদনের সুর না ঝরলেও, বিশ্বাস করাবার ব্যাকুলতাটুকু স্পর্শ করল কবীর চৌধুরীকে। এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল সে, 'তাকে বিশ্বাস করাবার দায়িত্ব তোমার, আমার নয়।'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে উঠে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করল পেরট। তারপর কবীর চৌধুরীর দিকে এগিয়ে এল। 'খেদিয়ে সবাইকে খাঁচায় ভরেছি, চীফ।' এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে জানতে চাইল, 'কেন?'

একদিকের মস্ত কাঁধ ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী। 'কি জানি! বোধহয় ডিকসনের কথাই সত্যি, ব্যাপারটা কাকতালীয়। কিন্তু আসলে তা যদি না হয়? কি ব্যবহার করবে ওরা? শেল? না। হাই এক্সপ্লোসিভ? না। গ্যাস শেল? গ্যাস শেল।'

'সেরকম কিছু আছে কি, চীফ?'

'আছে। তাতে যদি আমাদের সাথে প্রেসিডেন্ট আর তার মেহমানরাও কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারায়, ওরা মাইন্ড করবে না। তারপর গ্যাস-মাস্ক পরা পুলিস আর ট্রুপস পাঠিয়ে যুদ্ধটা জিতে নেবে। তবে কোচগুলো এয়ারকন্ডিশন করা, বাইরে থেকে বাতাস বা গ্যাস ভেতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব।'

'আমার মনে হয় না...'

'ওয়েট!'

পুলিস চীফ আবার ফোনে কথা বলছেন, 'বিশ্বাস করাতে জান বেরিয়ে গেছে, মি. চৌধুরী। তবু ভাগ্য, বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু কোন নির্দেশ মানতে রাজি হচ্ছেন না ক্যাপটেন। বলছেন, ইতিমধ্যে ব্রিজের এত কাছে চলে এসেছে নিউ জার্সি, এখন যদি ওটাকে ঘোরাবার বা রিভার্স অ্যাকশনের সাহায্যে থামাবার চেষ্টা করা হয় তাহলে ব্রিজ এবং জাহাজ দুটোরই ক্ষতি হবার ভয় আছে। বলছেন, নিউ জার্সি একটা টাওয়ারের সাথে ধাক্কা খেলেই তলিয়ে যাবে। হিসেব করে বললেন, ধাক্কাটার ওজন হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টন।'

'আল্লা আল্লা করো, কিছু যেন না ঘটে,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল কবীর চৌধুরী। পেরটকে পিছনে নিয়ে কোচের মাঝখানে চলে এল সে। ডান দিকের

জানালা দিয়ে পুব দিকে তাকাল, নিউ জার্সির সুপারস্ট্রাকচার ব্রিজের তলা দিয়ে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রেসিডেন্টকে আগের চেয়ে অনেক শান্ত দেখাল। কিন্তু পরিচিত, জনপ্রিয় হাসিটি নেই মুখে। তবে গলার সুরে ক্ষীণ একটু হাস্যরসের আভাস পাওয়া গেল। 'ঠিক কি ঘটছে, চৌধুরী?'

'আপনি জানেন। আমাদের নিচ দিয়ে ইউ.এস.এস. নিউ জার্সি যাচ্ছে।'

'তাতে কি? কোথাও না কোথাও যাওয়াই তো কাজ ওটার। আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন?'

'অস্থির হচ্ছি না। ভারছি, ওটা থেকে না আবার এদিকে কিছু ছুঁড়তে শুরু করে দেয় ক্যাপটেন।'

'এদিকে?' বিস্মিত দেখাল প্রেসিডেন্টকে। 'আমার দিকে?'

'জানি, আর্মড ফোর্সের আপনিই কমান্ডার-ইন-চীফ। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন, অধস্তনদের চোখের আড়ালে রয়েছেন আপনি আউট অভ সাইট, আউট অভ মাইন্ড। ওদের মধ্যে উচ্চাভিলাষী কেউ নেই, জোর করে বলেন কিভাবে? পথের কাঁটা সরাবার এই মোক্ষম সুযোগ যদি সে না হারাতে চায়? এসব না হয় বাদ দিন। কিন্তু ক্যাপটেন যদি মনে করে, কারও কথায় কান না দিয়ে নিজের বুদ্ধি মত কাজ করা তার একটা কর্তব্য, তখন? দেখা যাক, একটু পরেই জানতে পারব। ওই, বেরিয়ে আসছে।'

নিউ জার্সির সুপারস্ট্রাকচার দৃষ্টিপথে চলে এল। বন্দীরা সবাই যে যার আসন ছেড়ে ডান দিকের জানালাগুলোর সামনে দাঁড়ালেন। তাঁদের একজন এই সুযোগে কবীর চৌধুরীর বিপজ্জনক কাছে এসে পড়লেন। হঠাৎ করেই কবীর চৌধুরী তার বাঁ দিকের কিডনীতে শক্ত একটা কিছুর স্পর্শ অনুভব করল। সন্দেহ নেই, জিনিসটা ধাতব।

'আপনারই কথা—মানুষ তো আর ফেরেশতা নয়, ভুল তার হতেই পারে। কথাটা আপনার বেলায়ও সত্যি,' বললেন সাদ ফাহিম, যাঁর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রয়েছে। একগাল হাসলেন তিনি। 'এটা আপনারই রিভলভার চৌধুরী। আপনার লোকদের বলুন, যার যার রিভলভার আর মেশিন-পিস্তল যেন ফেলে দেয়।'

'গুড ম্যান!' প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বরে উল্লাস প্রকাশ পেল।

'চৌধুরী নয়, মি. চৌধুরী,' নরম সুরে সাদ ফাহিমকে ভুল শুধরে নিতে বলল কবীর চৌধুরী।

হা হা করে খানিক হাসলেন সাদ ফাহিম।

তাঁর হাসি থামতে কবীর চৌধুরী আবার শান্ত সুরে বলল, 'রিভলভারটা সরান। আমার লোকেরা প্রফেশনাল, এটা কেন বুঝছেন না?'

কথা শেষ করে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল কবীর চৌধুরী। তার এই দুঃসাহসিক আচরণ বিস্মিত করল সাদ ফাহিমকে, এক সেকেন্ডের জন্যে পরিবেশ ভুলে কবীর চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। এই এক সেকেন্ড সময় পেরেটের জন্যে যথেষ্ট। গুলির আওয়াজ হলো, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন সাদ ফাহিম। হাত থেকে রিভলভার ফেলে দিয়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া কাঁধ চেপে ধরলেন তিনি।

কাছেই ছিলেন শেখ খায়ের, ঝুঁকে পড়ে মেঝে থেকে রিভলভারটা তুলতে গেলেন তিনি। রিভলভার আর তাঁর হাতের ওপর সজোরে নেমে এল কবীর চৌধুরীর জুতো পরা গোড়ালি। মুট মুট কয়েকটা আওয়াজই বলে দিল, ভদ্রলোকের একাধিক আঙুল ভেঙে গেছে। অলস ভঙ্গিতে ঝুঁকে রিভলভারটা তুলে নিল কবীর চৌধুরী।

মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে একটু হাসল রস পেরট। তার মায়াভরা চোখে বেদনা। 'এছাড়া উপায় ছিল না, চীফ। আপনার প্রাণ বাঁচানো আমার ফরজ। ভদ্রলোককে আমি ওয়ার্নিং দিইনি, কারণ, আমার কথায় কান না দিয়ে উনি গুলি করতেন। কোচে বুলেট প্রূফ কাঁচ রয়েছে, বুলেট ছিটকে কার গায়ে লাগত কে জানে! উনি নিজেও নিহত হতে পারতেন।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল সে। ব্রিজ থেকে ইতোমধ্যে প্রায় আধ মাইল দূরে সরে গেছে নিউ জার্সি। আন্দাজ করা যায়, এই মুহূর্তে নিজেকে সুখী একজন মানুষ বলে ভাবতে পারছেন না ক্যাপটেন। ঘুরে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী, টেডিকে বলল, 'আমাদের কোচ থেকে হুয়ানকে ডেকে আনো।' বন্দীদের দিকে ফিরে বলল, 'আপনারা দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট করছেন কেন! বসুন, সবাই বসুন।'

নিঃশব্দে যে যার আসনে বসলেন সবাই। প্রেসিডেন্টকে দেখে মনে হলো, ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেছেন। প্রেসিডেন্টরাও আসলে সাধারণ মানুষ, ভাবল কবীর চৌধুরী। এই লাইনের চিন্তাভাবনা তার জন্যে লাভজনক নয় ভেবে ক্ষান্ত হলো সে। আর যাই হোক, রাজনীতির মত নোংরামি নিয়ে সময় নষ্ট করার মানসিকতা তার কোন দিনই হবে না।

'যা ঘটে গেল এরপর ফের আপনারা কেউ ছেলেমানুষি করবেন বলে আমি আশা করি না,' বলল সে। এগিয়ে গিয়ে কমিউনিকেশন কনসোলের সামনে দাঁড়াল। ফোন তুলে বলল, 'ডিকসন?'

'বলছি। এখন খুশি?'

'হ্যাঁ। হারবার-মাস্টারকে সাবধান করে দিয়ে বলো, ব্রিজের নিচ দিয়ে আর কোন ট্রাফিক যেতে পারবে না। না এদিক থেকে, না ওদিক থেকে।'

'ট্রাফিক যেতে পারবে না? কি বলছেন! গোটা পোর্ট যে তাহলে অচল হয়ে পড়বে! ফিশিং ফ্লিটগুলো...'

'ওগুলো বে-তে মাছ ধরুক। তাড়াতাড়ি একটা অ্যাম্বুলেন্স আর একজন ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও। দু'জন লোক কষ্ট পাচ্ছে এখানে। একজনের অবস্থা সিরিয়াস।'

'কারা? কিভাবে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন ডিকসন।

'দুই তেল মন্ত্রী—ফাহিম আর খায়ের। বলতে পারো, আত্মপীড়নের শিকার হয়েছে ওরা।' দেখল, কোচে উঠে তেল মন্ত্রী ফাহিমের কোটের আস্তিন কাঁচি দিয়ে কাটতে শুরু করেছে হুয়ান। 'ব্রিজে টিভি ক্যামেরা আসছে। বাধা দিয়ো না, আসতে দাও। ব্রিজে আমি কিছু চেয়ারও চাই—এই ধরো, গোটা চল্লিশেক।'

'চেয়ার?'

'কিনতে হবে না,' ধৈর্য না হারিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'কাছাকাছি কোন

একটা রেস্তোরাঁ থেকে ধার নাও।'

'চেয়ার?'

'লোকে যাতে বসে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি একটা নিউজ কনফারেন্স ডাকছি। নিউজ কনফারেন্সে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে না। তাদের বসতে দিতে হয়।'

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জানতে চাইলেন পুলিস চীফ, 'আপনি নিউজ কনফারেন্স ডাকছেন, টেলিভিশনে সেটা প্রচার করবেন বলে?'

'আরে, ঠিক ধরেছ তো! হ্যাঁ, গোটা দেশকে জানাব। মানে, দেখাব।'

'আপনার...আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'ভাল করার যোগ্যতা তোমার নেই। কলভিন আর নিউসম, ওরা এখন তোমার সাথেই তো?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র পৌচেছেন...' কমিউনিকেশন ভ্যানের পিছন দিকে তাকালেন পুলিস চীফ। জ্যাক কলভিন, সেক্রেটারি অভ স্টেট দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোক লম্বা-চওড়া, চুল উঠে যাওয়ায় কপালটা চাঁদের আকৃতি পেয়েছে। স্টীল রিমের চশমা পরে আছেন তিনি। সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী ডেভিড নিউসমের মাথার চুল সব সাদা, বেশ মোটা তিনি, মুখে হাসি নেই—লোকে বলে, কেবিনেট তাঁর কাছ থেকে টাকা চাইবে এই ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকেন বলে তিনি নাকি হাসতে ভুলে গেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ব্যাংকার এবং অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর মত খ্যাতি খুব কম লোকেরই আছে।

জ্যাক কলভিন বললেন, 'বলা সহজ লোকটা পাগল, কিন্তু আসলে কি তাই সে?'

'ওটা একটা কথার কথা, স্যার,' পুলিস চীফ বললেন, 'সত্যি যদি পাগল হয়ও, আমাদের সবার চেয়ে বুদ্ধিমান পাগল। একটা অসম্ভবকে কেমন সম্ভব করে তুলেছে, দেখুন না!'

'এবং হিংস্র, তাই না?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন পুলিস চীফ। 'কেন যেন, আমার তা মনে হয় না। এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল, কই, একজনকেও তো মেরে ফেলেনি। সিরিয়াসনেস বোঝাবার জন্যেও দু'চারজনকে মেরে ফেলতে পারত, আমরা সবাই তো সেই ভয়ই করেছিলাম। কিন্তু না, মারেনি, মি. ফাহিম আর মি. খায়ের নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছিলেন, হয়তো কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল চৌধুরী...'

ডেভিড নিউসম বললেন, 'মনে হচ্ছে লোকটা সম্পর্কে কিছু কিছু জানেন আপনি।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পুলিস চীফ। 'আমেরিকার সব সিনিয়র পুলিস অফিসার চৌধুরী সম্পর্কে জানে, স্যার। এবার নিয়ে পাঁচ বার আমাদেরকে বিপদে ফেলল।'

'লোকটার বিশেষত্ব কি?'

'অসম্ভব জেদি এক বিজ্ঞানী, স্যার,' পুলিস চীফ বললেন, 'এমন অদ্ভুত বিষয় নিয়ে গবেষণা করে, কোন দেশ তা অনুমোদন করতে পারে না। মানুষের পরমায়ু

তার একটা প্রিয় সাবজেক্ট। শোনা যায়, এ-বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নাকি বহু মানুষের প্রাণ নিয়েছে, ওই গবেষণার খাতিরেই।'

'তার খারাপ দিক সম্পর্কে...?'

'খারাপ দিক হলো, টাকার জন্যে করতে পারে না হেন কাজ নেই। ডাকাতি, ট্রেন লুট, প্লেন হাইজ্যাক, প্রেসিডেন্টের আপনজনকে কিডন্যাপ—এসব কাজে তাকে আমাদের বড় কুটুমও সাহায্য করে থাকে!'

'মাই গড! এর মধ্যেও রাশিয়া?'

'বেশ কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্টের এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক করেছিল চৌধুরী, তার এই অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল মস্কো,' বলে চললেন পুলিস চীফ, 'আমরা চাপ সৃষ্টি করি। মস্কো থেকে তখন আশ্বাস দিয়ে বলা হয়, এরপর চৌধুরী যাতে কোন রকম ভায়োলেন্সের মধ্যে না যায় সেদিকে তারা সাধ্যমত নজর রাখবে। সেজন্যেই আমার ধারণা হচ্ছে, চৌধুরীর পক্ষে হিংস্র হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তবে তাকে বাধ্য করা হলে আলাদা কথা।'

'কখনও ধরা পড়েনি?' কলভিন জানতে চাইলেন।

'অনেক বার। কিন্তু তাকে ধরে রাখা যায় না। কিভাবে যেন ঠিক বেরিয়ে পড়ে।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, লোকটার ওপর আপনার কিছু শ্রদ্ধা আছে!' বিস্মিত দেখাল সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীকে।

'চৌধুরীকে কয়েদ করার বিনিময়ে আমি আমার পেনশন হারাতেও রাজি আছি, স্যার। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, কাউকে যদি একটা কাজ নিখুঁতভাবে করতে দেখি তার প্রশংসা না করে পারি না। আজ পর্যন্ত চৌধুরীর কাজে আমি সাধারণ কোন ত্রুটি দেখিনি। আমার জানামতে বেশ কয়েকবারই সফল হতে হতেও ব্যর্থ হয়েছে সে, তার কারণ তার অহমিকা আর আত্মবিশ্বাস। প্রায়ই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।'

কয়েক সেকেন্ড আর কেউ কিছু বললেন না মনে হলো, সবাই ধ্যান করছেন। তারপর সেক্রেটারি অভ স্টেট জানতে চাইলেন, 'প্রায় সব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যালেরই একজন করে শত্রু থাকে, যাকে ভয় পায় সে। শত্রুটি এফ.বি.আই.-এর লোক হতে পারে, হতে পারে পুলিসের লোক, কিংবা সি.আই.এ., স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ইউনাকো...'

'সেরকম একজন সত্যি সত্যিই আছে, স্যার,' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পুলিস চীফের চেহারা। 'ইউনাকোর একজন এজেন্ট, নাম মাসুদ রানা। চৌধুরী তাকে ভয় পায় কিনা জানি না, তবে চৌধুরীর অনেকগুলো ব্যর্থতার জন্যে এই যুবক দায়ী।'

'ইউনাকোর সাথে এখনও তাহলে যোগাযোগ করছেন না কেন?'

ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করে সরাসরি ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করলেন ডিকসন। দু'মিনিট পর আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি। হাত নেড়ে হতাশ একটা ভঙ্গি করলেন। ইউনাকোর হেড অফিস বলছে, 'এই মুহূর্তে মাসুদ রানা কোথায় আছে ওরা জানে না। আভাস দিল, হঠাৎ তাকে খোঁজ করে পাওয়া সম্ভবও নয়।'

'এফ.বি.আই. চীফ জেনারেল ফিদার হোপ?' জানতে চাইলেন নিউসম।

'আমার তো ধারণা এ-ধরনের একটা ঘটনায় তারই সবচেয়ে বেশি অস্থির হবার কথা। কোথায় তিনি?'

'ওয়াশিংটন বলছে, তিনি কোথায় ওরা জানে না। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নিচ্ছে ওরা।' খানিক ইতস্তত করে পুলিস চীফ আরও বললেন, 'জেনারেল ফিদার হোপকেও হঠাৎ পাওয়া খুব মুশকিল, স্যার।'

'হ্যাঁ, নিজেকে লুকিয়ে রাখার অদ্ভুত একটা ম্যানিয়া আছে ভদ্রলোকের,' গম্ভীর দেখাল জ্যাক কলভিনকে। 'হয়তো দরজা বন্ধ করে টিভি দেখছেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার, গোটা আমেরিকায় এফ.বি.আই.-চীফ সবার শেষে খবরটা জানবেন।' এক মিনিট কি যেন ভাবলেন তিনি। 'রেডিও, টিভি, নিউজ এজেন্সী—সবগুলো ব্যবহার করতে যাচ্ছে চৌধুরী তার মানে ম্যাক্সিমাম পাবলিসিটি চাইছে সে। এর আগে এভাবে কখনও জনসাধারণের সামনে এসেছে সে?'

'না। ঠিক এভাবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কলভিন স্বীকার করলেন, 'নাহ্, এ-লোকের নিজের ওপর বিশ্বাস আছে বটে।'

ডেভিড নিউসম বললেন, 'তার জায়গায় আমি হলে, আমারও ওই আত্মবিশ্বাস থাকত। তার পজিশনটা লক্ষ্য করুন। হারাবার আছেটা কি?'

'আমি কিন্তু, স্যার, আশা ছাড়িনি,' সবিনয়ে বললেন পুলিস চীফ। ফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন, কিন্তু সাথে সাথে ডায়াল করলেন না। 'মাসুদ রানার খোঁজ দিতে পারবে এমন একজনের কথা মনে পড়েছে, স্যার। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

'প্রেসিডেন্টের বিশেষ বন্ধু।'

'তিনি কিছু কিছু সরকারী দায়িত্বও পালন করেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কেউ সে-সম্পর্কে কিছু জানেন না।' ডায়াল করলেন তিনি। কথা বললেন এক মিনিট। রিসিভার রেখে দিয়ে একটু হাসলেন। পরাজয়ের হাসি। 'অ্যাডমিরালও কিছু বলতে পারলেন না। তবু, তিনি আসছেন।'

'কি করা হবে, সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে?' জানতে চাইলেন কলভিন।

'জ্বী, স্যার। আমাদের হেডকোয়ার্টারে জেনারেল গারল্যান্ড আর অ্যাডমিরাল সোরেনসন আলোচনা করছেন।'

'গারল্যান্ড। সোরেনসন। আমাদের দুই প্রতিভা।' সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীকে ম্লান দেখাল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। 'কি অদ্ভুত, তাই না? ব্রিজের দিকে তাকান। সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, অথচ কারুরই করার কিছু নেই। যে যাই বলুন, আমি কিন্তু ভয়ানক অসহায় বোধ করছি।'

'আরে, এতটা ঘাবড়িয়ো না তো?' সেক্রেটারি অভ স্টেট জোর করে হাসলেন। 'দেখাই যাক না কি হয়। একটা উপায় নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবে। জেনারেল ফিদার হোপ নিশ্চয়ই...'

'আমি ফিদার হোপের কথা ভাবছি না, ভাবছি নিজের কথা,' ডেভিড নিউসম বললেন। 'কেউ বলে না দিলেও এইটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে যে সঙ্কটের

মাঝখানে এই আমাকেই গিয়ে পড়তে হবে।'

'স্যার!' চোখ বড় বড় করে তাকালেন পুলিস চীফ।

'বুঝতে পারছেন না? চৌধুরী তার দুর্লভ সঙ্গ দেয়ার জন্যে আমাকে বেছে নিয়েছে—কেন?'

ট্রাউজারের দু'পকেটে হাত, যেন গভীর চিন্তামগ্ন, ব্রিজের পুবদিক ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছে রানা। মাঝে মধ্যে থামছে ও, সামনে বিস্তৃত প্রকৃতির অপরূপ রূপসুধা পান করছে। ওর বাঁ দিকে, ফোর্ট বেকার, টিবুরন আর অ্যাঞ্জেল দ্বীপ, আরও দূরে দেখা যাচ্ছে বেলভেদার দ্বীপের ডগা, এটাই বে-র সবচেয়ে বড় দ্বীপ। ওর ডান দিকে শহর, আর নাক বরাবর আলকাটরাজ দ্বীপ, তারপর ট্রেজার অ্যাইল্যান্ড। এদের মাঝখানে দ্রুত আবছা হয়ে আসছে নিউ জার্সি, চলেছে আলামেডায় নোঙর ফেলার জন্যে। আরও কয়েকবার থামল রানা, উঁকি দিয়ে তাকাল ব্রিজের নিচে। এই রকম একবার উঁকি দেয়ার সময় সহজ ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে সবুজ কর্ডটা ধরল ও, ঝাঁকি দিয়ে অনুভব করল আগের সেই ওজন আর নেই।

'কি করছ, প্রদ্যুৎ?'

শান্তভাবে ঘুরল রানা। জুলির সবুজ চোখে কৌতূহল যদি নাও থাকে, বিস্ময়ের কোন অভাব নেই।

'তোমার পায়ে তুলো জড়ানো আছে। ভেবেছিলাম দু'চার মাইলের মধ্যে আমি একা—মানে গজের মধ্যে।'

ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল জুলি। তারপর খপ্ করে রানার একটা কব্জি চেপে ধরল। 'কি করছিলে তুমি?'

'এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর তুমি, দুটো সামনে থাকলে জানি না কোন্‌টা আমি বেশি পছন্দ করব। বোধহয় তোমাকে। তোমাকে বরং সুন্দরীই বলা যায়, আগে এ-কথা কেউ বলেছে?'

'অনেকেই।' হাত বাড়িয়ে সবুজ কর্ডটা দু'আঙুলে ধরে ওপর দিকে তুলতে শুরু করল জুলি। পরমুহূর্তে ব্যথায় উফ্ করে উঠে ছেড়ে দিল সেটা।

জুলির হাত ছেড়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল রানা, 'ওটার দিকে আর তাকিয়ো না।'

নিজের কব্জি ডলতে শুরু করল জুলি। চোখের সামনে কব্জি তুলে পরীক্ষা করল। 'ইস্, লাল হয়ে উঠেছে।'

'কাউকে খামচে ধরলে কেমন লাগে, বোঝো!'

আবার নিজের চারদিকে তাকাল জুলি। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'ব্যাপারটা কি, আমাকে বলবে না?'

'মাছ ধরছি।'

'অ্যাঙলাররা খুব গপ্পোবাজ হয়, তাই না?'

'তুমি যদি বলো।'

'তাহলে আমাকে একটা গল্প শোনাও।'

'তুমি সুন্দরী, কিন্তু বিশ্বস্ত কি?'

'আমি কি সুন্দরী? তবে আমি অ্যাঙলার নই।'
'তা নও।'
'তাহলে আমি গপ্পোবাজও নই,' ফিসফিস করে বলল জুলি। 'কাজেই যা শুনব, দু'কান হবে না। তোমার গল্পটা বেশ বড় হবে তো?'
'হ্যাঁ।' জুলির একটা হাত ধরল রানা। 'প্লীজ।'
দু'জন একসাথে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল ওরা।

•

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন পুলিস চীফ। সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীর দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনারা তৈরি তো, স্যার?'

জ্যাক কলভিন উঠে দাঁড়ালেন। সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকালেন ডেভিড নিউসমের দিকে। 'আমার বা প্রেসিডেন্টের মত তোমার শার্টটাও নীল হওয়া উচিত ছিল, ডেভিড। সাদা জিনিস টিভিতে যাচ্ছেতাই দেখায়।'

'ওহ্ শাট আপ!' আওয়াজ শুনে ভ্যানের পিছন দিককার দরজার দিকে ফিরলেন নিউসম। মোটরসাইকেল থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল একজন আরোহী। বাহন দাঁড় করিয়ে ধাপ বেয়ে ভ্যানে চড়ল সে। পুলিস চীফের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার জন্যে, স্যার।'

আট ইঞ্চি লম্বা, সরু সিলিন্ডারটা নিলেন ডিকসন। নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার নাম লেখা রয়েছে। কোত্থেকে আনছ?'

'নিউ জার্সি থেকে পাইলট বোট নিয়ে এসেছে, স্যার। নিউ জার্সির ক্যাপটেন বলে পাঠিয়েছেন, এটা একটা আর্জেন্ট ব্যাপার হতে পারে।'

সাত

গোল্ডেন গেট ব্রিজের মাঝখানে যেন হাট বসেছে।

কোচ তিনটেই আছে, কিন্তু পুলিস কার একটা থেকে বেড়ে দুটো, তারপর তিনটে হয়েছে। ওতে চড়ে এইমাত্র ব্রিজে পৌঁছলেন দুই সেক্রেটারি জ্যাক কলভিন আর ডেভিড নিউসম। ওঁদের সাথে পুলিস চীফ আর্ল ডিকসনও আছেন। নতুন আরও দুটো বড় আকারের ভেহিকেল এসেছে, গায়ে লেখা—রেস্টরুম। আমদানী হয়েছে একটা অ্যাম্বুলেন্স, কেন তা একমাত্র কবীর চৌধুরীই বলতে পারবে। বাকি তিনটের মধ্যে একটা ভ্যান, একটা ওয়াগন, একটা ট্রাক। ভ্যানে রয়েছে কম্বল, বালিশ, চাদর ইত্যাদি। কবীর চৌধুরীর জিম্মি এবং মেহমানরা ব্রিজেই রাত কাটাবেন, কাজেই এগুলো লাগবে। ট্রাকে রয়েছে বিশাল একটা টিভি ক্যামেরা, জেনারেটর সহ। আর ওয়াগনে রয়েছে গরম খাবারদাবার।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আরও রয়েছে এক জোড়া হেলিকপ্টার, ট্রাকের ওপর বসানো অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান, সশস্ত্র প্রহরী। ব্রিজের দুই মুখে ব্যস্ততার সাথে ব্যারিয়ার তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে আর্মি ইঞ্জিনিয়াররা।

জায়গামত বসানো হয়েছে ক্যামেরা। জিম্মিরাও তাদের নির্ধারিত জায়গায় আসন নিয়েছেন। সদ্য আগত তিনজনও বসেছেন। তাদের পিছনে চেয়ার পেয়েছে রিপোর্টাররা। ফটোগ্রাফাররা যার যেখানে ভাল মনে হয়েছে সেখানে পজিশন নিয়েছে, তবে কেউই সশস্ত্র প্রহরীদের কাছ থেকে কয়েক ফিটের বেশি দূর নয়। এদের সবার দিকে মুখ করে, একা বসে আছে কবীর চৌধুরী। তার কাছাকাছি অদ্ভুত আকৃতির একটা জিনিস পড়ে রয়েছে, ক্যানভাস দিয়ে মোড়া। পাশেই ভারী একটা বাক্স, ঢাকনা বন্ধ।

'ভদ্রমহোদয়গণ, অযথা সময় নষ্ট করে আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না,' বলল কবীর চৌধুরী। এই মুহূর্তে সে যে গর্বিত, সেটা তার চেহারাই বলে দিল। দুনিয়ার সেরা কয়েকজন ক্ষমতাবান মানুষকে মুঠোর ভেতর পুরে নিজের দয়ার ওপর বাঁচিয়ে রেখেছে, এরচেয়ে গর্বের বিষয় আর কি হতে পারে? সে জানে, কম করেও একশো মিলিয়ন দর্শক তার উপস্থাপিত এই অনুষ্ঠান দেখছে এবং শুনছে টিভিতে। তবু তাকে প্রশান্ত দেখাল। বসে থাকার ভঙ্গিটাও শিথিল। 'আমরা সবাই এখানে কেন, সেটা আপনারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছেন।'

'বিশেষ করে আমি এখানে কেন, সেটা বুঝতে কারও বাকি নেই,' বলল সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী ডেভিড নিউসম।

মুচকি একটু হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে। 'ঠিক।'

'কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনার মত আমি নিজেই আইন নই। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বা অধিকার আমার নেই।'

'ঠিক কথা। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগের কাজ আগে, তাই না মি. নিউসম?'

'টাকা।'

'আলবৎ।'

'কত?' কোন রকম ভণিতার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি জানতে চাইলেন নিউসম।

'এক মিনিট, মি. সেক্রেটারি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। বিশ কোটি আমেরিকানের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান তিনি, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অবস্থায় হলেও, তাঁর একটা ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। 'টাকা তোমার কেন দরকার, চৌধুরী?'

'তা জেনে আপনার কোন কাজ নেই। আপনাকে অনুরোধ করা হলে, তখন মুখ খুলবেন। চুপ করে বসে থাকুন।'

একজন প্রেসিডেন্টের সাথে এভাবে কেউ কথা বলতে পারে, শুনেও বোধহয় বিশ্বাস করতে পারল না কেউ।

'আমাকে জানতে হবে বৈকি,' শান্ত কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, এই টাকা যদি কোথাও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে দরকার হয়, যদি কোন ক্ষতিকর কাজের জন্যে দরকার হয়, বিশেষ করে যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছু করার জন্যে দরকার হয়—এখানে, এই মুহূর্তে আমি ঘোষণা করছি, তার আগে আপনাকে আমার লাশ ডিঙাতে হবে।'

প্রশংসা করার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী। 'ভাষণ-লেখকদের

সাহায্য না নিয়েও যা বললেন, চমৎকার বললেন, মি. প্রেসিডেন্ট। জানি, ভোটারদের খুশি করার জন্যে বললেন, যাতে আগামী ইলেকশনে আবার নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু ভোটারদের আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, আপনি ডাহা মিথ্যে কথা বললেন। টাকা দেয়ার বদলে আপনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন, আপনার পোষা কুকুরটিও তা বিশ্বাস করবে না। তবে, প্রসঙ্গক্রমে বলছি, আপনাদের কাছ থেকে যে টাকাটা বের করে নেব তার একটি পয়সাও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হবে না। কিছুটা বেরিয়ে যাবে দেনা শোধ করতে। বাকিটা আমি আমার গবেষণার কাজে লাগাব।'

প্রেসিডেন্টকে এত সহজে কোণঠাসা করা সম্ভব নয়, তিনি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'শুনেছি বটে আপনি একজন বিজ্ঞানী। কিন্তু তাদের বিবেক বলে একটা ব্যাপার থাকে। আপনার?'

'সত্যি কথা বলতে কি, জানি না,' খোলাখুলি বলল কবীর চৌধুরী। 'যেখানে টাকার প্রশ্ন—নেই। দুনিয়ায় যারা সত্যিকার ধনী লোক, তাদের মানুষ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। নৈতিকতা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। বেশিরভাগই ক্রিমিন্যাল-মাইন্ডেড। মালটি-মিলিওনিয়ার, রাজনীতিক, আইনবিদ—এরা আবার ভাল মানুষ হলো কবে? কিন্তু উত্তর দেবার দরকার নেই। সম্ভবত ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আপনাকে আমি অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছি। আসলে আমার কিছু টাকার দরকার, এবং সেটা আমি আদায় করে তবে ছাড়ব।'

'মেনে নিলাম,' সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী বললেন, 'আপনি একজন সৎ চোর। এবার প্রসঙ্গে আসা যাক, কি বলেন?'

'আমি আমার সঙ্গত দাবি তাহলে পেশ করতে পারি?' সকৌতুকে জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

'ভণিতা রাখুন, চৌধুরী।'

'মি. চৌধুরী!' হঠাৎ রুদ্র মূর্তি ধারণ করল কবীর চৌধুরী।

'মি. চৌধুরী।'

তেল মালিকদের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। ওদের মাঝখানে সাদ ফাহিম নেই। তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর, প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল সে। 'তেলের দাম বাড়িয়ে গরীব দেশের সব সম্পদ লুট করে নিচ্ছে ওরা। এই লুটেরাদের ছেড়ে দেব আমি, বিনিময়ে আমাকে দিতে হবে, এক কানা কড়িও কম নেব না—তিনশো মিলিয়ন ডলার। তিন সংখ্যাটা লিখে আটটা শূন্য দিতে হবে। আর, মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার দাম ধরেছি আমি দুশো মিলিয়ন ডলার। মোট পাঁচশো মিলিয়ন হলো।'

কোটি কোটি টিভি দর্শক ভুল করে ধরে নিল, সাউন্ড ট্র্যান্সমিশনে নিশ্চয়ই গোলযোগ রয়েছে। কারণ, ঝাড়া এক মিনিট তারা কোন আওয়াজ পেল না। আওয়াজ না পেলেও, দর্শকরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিত্বদের মুখের অভিব্যক্তি ঘন ঘন বদলে যেতে দেখল। চেহারা বদল হলো এইরকম—কখনও রাগে লাল, কখনও বিস্ময়ে বিমূঢ়, কখনও হতাশায় ম্লান, কখনও অবিশ্বাসে হাঁ।

সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী অঙ্কে পারদর্শী, সবার আগে তিনিই ফিরে পেলেন

মুখের ভাষা। তাঁর মনে হলো, তিনি ভুল শুনেছেন। জানতে চাইলেন, 'অঙ্কটা আরেকবার বলবেন?'

'পাঁচ শূন্য শূন্য, কমা, শূন্য শূন্য শূন্য, কমা, শূন্য শূন্য শূন্য, দাঁড়ি। আমাকে যদি একটা ব্ল্যাকবোর্ড আর একটুকরো চক দেয়া হয়, লিখে দিতে পারি।'

'কি ভয়ঙ্কর! কল্পনার বাইরে! উদ্ভট! এই লোক উন্মাদ, উন্মাদ, উন্মাদ!' প্রেসিডেন্ট, যাঁর মুখের রঙ যথেষ্ট লাল হয়ে ওঠায় কালার টিভিতে দারুণ দেখাচ্ছে, ঘুসি মারার জন্যে এদিক ওদিক তাকালেন, কিন্তু কাছেপিঠে কোন টেবিল দেখলেন না। 'কিডন্যাপিং ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শাস্তি কি জানেন আপনি?'

'জানি। এ-ও জানি, আমি ব্যর্থ হলে তারচেয়েও বড় শাস্তি দেবেন আমাকে—মৃত্যুদণ্ড—দরকার হলে আইন তৈরি করে হলেও। কিন্তু আমাকে টাকা না দেবার অপরাধে আপনার কি শাস্তি হবে, জানেন?' পকেট থেকে রিভলভার বের করল কবীর চৌধুরী। 'না, গুলি করব, আর আপনি মরে যাবেন, সেটা আমার কাম্য নয়। আমি আপনার হাঁটুতে গুলি করব। দশ কোটি দর্শক সেটা দেখবে। তখন, সত্যি সত্যি, আপনার ওই ছড়িটা কাজে আসবে।'

প্রেসিডেন্ট তাঁর হাত দুটো মুঠো করলেন। মনে হলো, যতটুকু চুপসে গেলেন ততটুকু চেয়ারের ভেতর সেঁধিয়ে গেলেন না। মুখের লালিমা একটু যেন ম্লান দেখাল।

'দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের সেরা নাগরিক আপনারা,' আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'সব কিছুকে খুব বড় করে দেখতে, খুব বড় করে চিন্তা করতে শিখেছেন। এটা ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ, মিসকিনের বা তলাহীন ঝুড়ির দেশ নয়। আপনাদের কাছে পাঁচশো মিলিয়ন ডলার কি? একজোড়া পোলারিস সাবমেরিনের সমান? চাঁদে একজন লোককে পাঠাতে যে খরচ হয়, তার একটা কণা? আমেরিকার বোতল থেকে আমি যদি এক ফোঁটা মধু নিই, কেউ না খেয়ে মরবে না। কিন্তু আমাকে যদি ওই এক ফোঁটা নেয়ার অনুমতি না দেয়া হয়, আপনি এবং আপনার মেহমানরা মরবেন।

'তারপর ভাবুন, এই সামান্য টাকা না দিয়ে আর কি কি আপনারা হারাতে যাচ্ছেন। পাঁচশো মিলিয়ন ডলারকে দশ দিয়ে পূরণ করুন, একশো দিয়ে পূরণ করুন। সান রাফায়েলে আপনারা রিফাইনারি তৈরি করতে যাচ্ছেন, রিফাইন করার জন্যে আরব থেকে নাম মাত্র মূল্যে তেল পাবার আশা করছেন। সেই চুক্তিতে সই করার জন্যেই তো এসেছেন বাদশা আর প্রিন্স। কিন্তু ওঁরা যদি আমার হাতে মারা পড়েন, ভবিষ্যতে ওই চুক্তি কি আর হবে? আর, তেল বিনা আমেরিকা কি দুনিয়ার সেরা ধনী দেশ খুব বেশি দিন থাকতে পারবে?' প্রেসিডেন্টের এনার্জি জার স্টিফেন বেকারের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'আপনি কি বলেন, মি. বেকার?'

এই প্রথম দেখা গেল স্টিফেন বেকারের হাত এবং চোখ সম্পূর্ণ স্থির হয়ে আছে। উত্তরে তিনি এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেললেন না। তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী, ডেভিড নিউসম। তিনি বললেন, 'ভবিষ্যৎ আমি আপনার দৃষ্টিতেই দেখছি!'

'ধন্যবাদ।'

বাদশা হাত তুললেন, 'আমার একটা কথা, যদি অনুমতি পাই।' প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং তা নিরঙ্কুশ করার জন্যে প্রায়ই যাঁকে নিকট আত্মীয়দের গর্দান নিতে হয়, জীবনের রূঢ় বাস্তবতা এবং কঠিন সময় তাঁর কাছে নতুন কোন অভিজ্ঞতা নয়। হিংস্রতার মধ্যেই তাঁর জন্ম, হিংস্রতার মধ্যেই বেঁচে আছেন, এবং সম্ভবত হিংস্রতার শিকার হয়েই শেষ বিদায় নিতে হবে তাঁকে।

'অনুমতি দেয়া হলো।'

'শুধু অন্ধরা বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। আমি অন্ধ নই। প্রেসিডেন্ট টাকা দেবেন।' এই উদার প্রস্তাব শুনে মন্তব্য করার মত কিছু পেলেন না প্রেসিডেন্ট। রাস্তার দিকে নিবিষ্ট চিত্তে তাকিয়ে আছেন তিনি, যেন একজন ভবিষ্যৎ-বক্তা তাঁর ক্রিস্টাল বলের দিকে তাকিয়ে যা দেখতে পাচ্ছেন, মক্কেলকে তা জানাতে চাইছেন না।

'ধন্যবাদ, ইওর হাইনেস।'

'অবশ্যই আপনাকে খুঁজে বের করে নির্দয় ভাবে গুলি করে মারা হবে, দুনিয়ার যেখানেই আপনি লুকান না কেন। এমন কি আপনি যদি এই মুহূর্তে আমাকে খুনও করেন, আপনার মৃত্যু কালকের সূর্য ওঠার মতই নিশ্চিত হয়ে গেছে।'

'আমি বলেছি, প্রেসিডেন্টের পায়ে গুলি করব। কিন্তু আপনাকে, বাদশা মিঞা, আমার লোকেরা তাড়া করবে। একসময় আপনি কোণঠাসা হয়ে পড়বেন। তিন দিকের কোন দিকে আপনি যেতে পারবেন না, খোলা থাকবে শুধু ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়ার পথটা। আবোলতাবোল না বকে, দৃশ্যটা কল্পনা করতে থাকুন।' সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীর দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'আমার দাবির টাকা দিতে রাজি তো? কারও কোন আপত্তি নেই? গুড। শুরুটা বেশ ভালই হলো।'

'শুরু?' প্রশ্নটা করলেন জেনারেল পীল। যে-কেউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেই তাঁর চোখে ফায়ারিং স্কোয়াড দেখতে পাবে। 'মানে?'

'শুরু মানে শুরু। যার শুরু আছে তার শেষও আছে, আমার দাবিরও শেষ আছে। আরও দুশো মিলিয়ন ডলার। এই টাকাটা চাইছি আমি গোল্ডেন গেট ব্রিজের জন্যে।'

এবারের নিস্তব্ধতা আগের মত দীর্ঘ হলো না। বিস্ময়ের আঘাতও কিছুটা কম লাগল। তার একটা কারণ এই যে মানুষের মনের গ্রহণ ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। রাস্তা থেকে চোখ তুলে ম্লান সুরে তিনি জানতে চাইলেন, 'গোল্ডেন গেট ব্রিজের জন্যে দুশো মিলিয়ন ডলার মানে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি খুব কম চেয়েছি। বলতে গেলে, পানির দর। এ-কথা সত্যি ব্রিজটা তৈরি করতে মাত্র চার কোটি ডলারের মত লেগেছিল। এখন বানাতে গেলে চল্লিশ কোটির কমে পারা যাবে না, অন্তত টেন্ডার ডাকলে এর কমে কোটেশন দেব না আমি। কিন্তু আমি চাইছি কত? মাত্র বিশ কোটি। একেবারে সস্তা নয়? টাকার কথা বাদ দিয়ে চিন্তা করুন, ব্রিজটাকে নতুন করে বানানো কি সাংঘাতিক ঝামেলার ব্যাপার হবে। চিন্তা করুন ধুলোর কথা, পরিবেশ দূষণের

কথা, বিকট আওয়াজের কথা। তারপর যোগাযোগ? ব্রিজ না থাকলে হাজার হাজার যানবাহন কিভাবে আসা-যাওয়া করবে? ইকনমি ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে না? ট্যুরিস্টরা সান ফ্রান্সিসকোয় কেন আসবে, গোল্ডেন গেট ব্রিজই নেই! বিখ্যাত হাসি ছাড়া মোনালিসা আর গোল্ডেন গেট ব্রিজ ছাড়া সান ফ্রান্সিসকো একই কথা। যারা এই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত, জীবন তাদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। লাভবান হবে শুধু ফেরী সার্ভিসগুলো, সুযোগ পেয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নেবে ওরা। তাই বলছি, একদম পানির দর। আরে বাবা, আপনাদের কাছে দুশো মিলিয়ন ডলার আবার একটা টাকা নাকি! রাজি হয়ে যান।'

'আমরা যদি আপনার এই উদ্ভট প্রস্তাব মেনে না নিই,' জানতে চাইলেন সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী, 'গোল্ডেন গেট ব্রিজ নিয়ে কি করবেন আপনি? তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও বসাবেন?'

'উড়িয়ে দেব।'

'উড়িয়ে দেবেন! গোল্ডেন গেট ব্রিজ উড়িয়ে দেবেন!' মেয়র মাইক সিলভার, যিনি কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত হতে জানেন না, প্রায় লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছেন। কেউ কিছু বোঝার আগেই বাঘের মত ঝাঁপ দিলেন কবীর চৌধুরীকে লক্ষ করে।

দশ কোটির ওপর টিভি দর্শক দেখল, নিজের চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ল কবীর চৌধুরী। তার মাথাটা রাস্তার সাথে ঠকাস করে ঠুকে গেল। প্রচণ্ড রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন মেয়র। আবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কবীর চৌধুরীর ওপর। এক পা সামনে এগিয়ে তার মাথায় মেশিন-পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল রস পেরট। পরমুহূর্তে বন করে আধ পাক ঘুরে বসে থাকা জিম্মিদের দিকে ফিরল সে। 'খবরদার! কেউ নড়বেন না!' যদিও, নড়ছিল না কেউই।

আবার নিজের চেয়ারে উঠে বসতে বিশ সেকেন্ড সময় নিল কবীর চৌধুরী। শিষ্যরা তার নাকের রক্ত মুছিয়ে দিল। ঠাণ্ডা পানি দিল ফুলে ওঠা মাথায়। ডাক্তার মেয়রকে নিয়ে ব্যস্ত। কবীর চৌধুরী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম বুঝছেন, ডাক্তার?'

আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে ডাক্তার মুখ তুলল, 'ঠিক হয়ে যাবেন। মাথার পিছনটা ফুলে গেছে, তবে খুলির চামড়া ছেঁড়েনি।' পেরটের দিকে একবার তাকাল। 'আপনার সাগরেদ মেপে মেরেছে, আশ্চর্য হাতের আন্দাজ।'

'প্র্যাকটিস,' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল কবীর চৌধুরী। 'মেয়র তাঁর নিজের শক্তি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।'

'ভদ্রলোককে নিয়ে কি করব আমি, চীফ?'

'ওকে আর বিরক্ত কোরো না। এটা তাঁর শহর, তাঁর ব্রিজ। আমারই দোষ—তাঁর অহংকারে পা দিয়ে ফেলেছি।' মেয়রের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে। 'অন সেকেন্ড থট ভদ্রলোককে বরং হাত কড়া পরিয়ে দাও। আমি চাই না পরের বার আমার ঘাড় থেকে মাথাটা নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করুক।'

নিজের চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন জেনারেল পীল। তাঁর দিকে মেশিন-পিস্তল

তাক করল পেরট, কিন্তু সেদিক তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কবীর চৌধুরীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি চীফ অভ স্টাফ হতে পারি, কিন্তু আমি একজন আর্মি ইঞ্জিনিয়ার। তার মানে, বিস্ফোরক সম্পর্কে জানি। গোল্ডেন গেট ব্রিজ বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। ওই টাওয়ারগুলো ফেলতে এক ওয়াগন বিস্ফোরক লাগবে। এখানে তা নেই।'

'নেই, দরকারও নেই।' হাত বাড়িয়ে মোটা ক্যানভাস স্ট্র্যাপ দেখাল কবীর চৌধুরী, যেটার ভেতর থেকে মোচা আকৃতির কি যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে। 'দেখলেই চিনতে পারবেন। আপনি যখন এক্সপার্ট।'

স্ট্র্যাপের দিকে তাকালেন জেনারেল পীল। মুখ তুলে কবীর চৌধুরীকে দেখলেন। তারপর তাকালেন বসে থাকা বন্ধু-বান্ধবদের দিকে। সবশেষে আবার ফিরলেন স্ট্র্যাপটার দিকে।

কবীর চৌধুরী বলল, 'কেন জানি না, আমার মুখ ব্যথা করছে। আপনিই ওদেরকে বলুন।'

একটা বিশাল টাওয়ারের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল পীল, সেটা থেকে ঝুলে পড়া কেব্‌লগুলোও দেখলেন। তারপর কবীর চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছেন?' মাথা ঝাঁকাল পাগল বৈজ্ঞানিক। 'নিশ্চয়ই সাফল্যের সাথে—তা না হলে এখানে আপনাকে দেখা যেত না।' আবার মাথা ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী।

ধীরে ধীরে বন্ধু আর রিপোর্টারদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন জেনারেল পীল। 'আমারই ভুল হয়েছিল। এখন বিশ্বাস করি, মি. চৌধুরী ব্রিজটাকে ধ্বংস করতে পারবেন। ক্যানভাস স্ট্র্যাপের ভেতর মোচার যে আকৃতিগুলো দেখছেন, ওগুলোর ভেতর টি-এন-টি অ্যামাটল আছে। মোচাগুলোকে বলা হয় বি-হাইভস। এক হন্দর বিস্ফোরকসহ একটা স্ট্র্যাপ সাসপেনশন কেব্‌লে বেঁধে দেয়া হবে, সম্ভবত টাওয়ারের মাথার কাছাকাছি।' কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরল সে। 'আমার ধারণা, এগুলো আপনার কাছে চারটে আছে।' মাথা ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী। 'এবং চারটে একসাথে ফায়ার করার ব্যবস্থা করেছেন?' বন্ধুদের দিকে ফিরলেন আবার। 'হ্যাঁ, গোল্ডেন গেট ব্রিজ ধ্বংস করা মি. চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব।' আবার কবীর চৌধুরীর দিকে ঘুরলেন তিনি। 'ওগুলো একসাথে ফাটবে কিভাবে?'

'রেডিও ওয়েভ একটা সেলকে অ্যাকটিভেট করবে। মার্কারি ফালমিনেট ডিটোনেটরের অয়্যারকে ওই সেল পোড়াবে। একটা বিস্ফোরণই যথেষ্ট, বাকিগুলো বিস্ফোরিত হবে সিমপ্যাথেটিক ডিটোনেশনের সাহায্যে।'

ভারী গলায় সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী জানতে চাইলেন, 'আশা করি এটাই আপনার শেষ দাবি ছিল?'

'শেষ? দুঃখিত, না।' মাথা ঝাঁকিয়ে মাফ চাওয়ার একটা ভঙ্গি করল কবীর চৌধুরী। 'আর মাত্র দুটো দাবি আছে আমার।'

'আরও দুটো!' ট্রেজারী সেক্রেটারি আঁতকে উঠলেন।

'এর আগে কয়েকটা কাজে আমি ব্যর্থ হয়েছি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ব্যর্থতার খেসারতও আমাকে দিতে হয়েছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার

ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। ওই টাকাটা আমি ফেরত চাই। সুদ সহ। সুদ ধরছি, শতকরা একশো ভাগ। অর্থাৎ একশো মিলিয়ন ডলার দিতে হবে আমাকে। এটা আমার সবচেয়ে ন্যায্য দাবি। টাকাটা আপনাদের নয়, আমার। সেটা আপনারা এতদিন খাটিয়েছেন। খাটিয়ে লাভ করেছেন মেলা, তবু লাভের সবটুকু আমি চাইছি না। মোট একশো মিলিয়ন দিলেই আমি খুশি।'

সবাই চুপ।

'আমার পাঁচ নম্বর এবং শেষ দাবি। এটা একটা সামান্য ব্যাপার। বলতে পারেন, আপনাদের হাতের ময়লা মাত্র—পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার।'

'এটা কি বাবদে?' ট্রেজারী সেক্রেটারির দুইপাটি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিস হিস শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল কথাগুলো।

'আমার খরচপাতি বাবদ,' বলল কবীর চৌধুরী।

'আপনার যা স্ট্যান্ডার্ড, খুব কমই চেয়েছেন!' বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমি হাসব না কাঁদব, কিছুই বুঝতে পারছি না!' ট্রেজারী সেক্রেটারি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন—দু'বার।

'এখন যদি দয়া করে আপনারা সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন, আমি বাধিত হব। টাকা আমি পাচ্ছি তো?'

সবাই চুপ।

'নিউ ইয়র্কে আমার এক বন্ধু আছে, তার সাথে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে আমাকে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'নির্দিষ্ট কয়েকটা ইউরোপিয়ান ব্যাংকে তার কিছু লোক আছে।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'এখন দুপুর, তার মানে সেন্ট্রাল ইউরোপে আট কি নয়টা বাজে— কিন্তু ওখানে সন্ধে ছ'টার মধ্যে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই কাল সকাল সাতটার মধ্যেই আপনারা যদি আপনাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন আমাকে, বাধিত হব।'

'কিসের সিদ্ধান্ত?' সাবধানে জানতে চাইলেন সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী।

'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে কিনা অর্থাৎ টাকাটা আমি পাব কিনা,' বলল কবীর চৌধুরী। 'সোয়া আটশো মিলিয়ন ডলার, খুব কম টাকা বলতে পারি না। সেটার ধরন, আকৃতি, আকার ইত্যাদি কি রকম হবে, জানাবেন না? বাজারে চলে এই রকম যে কোন কারেন্সি হলেই চলবে। টাকায় চিহ্ন দেয়া থাকলেও আমার কিছু যায় আসে না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর কবীর চৌধুরী মাথা ঝাঁকিয়ে আবার বলল, 'আপনারা সবাই যদি এই রকম শোকে কাতর হয়ে পড়েন তাহলে চলবে কি করে! একেবারে যেন পাথর হয়ে গেছেন! হাত-পা ছুঁড়ে উন্মাদের মত চিৎকার জুড়ুন তা বলছি না, কিন্তু তীক্ষ্ণ দু'একটা প্রশ্নও তো করতে পারেন!'

সবাই তাকিয়ে থাকল শুধু। কেউ এক চুল নড়ল না পর্যন্ত। অগ্নিদৃষ্টির যদি কোন তাপ থাকত, এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যেত কবীর চৌধুরী।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার প্রসঙ্গে ফিরে এল পাগল বৈজ্ঞানিক, 'আমার নিউ ইয়র্কের বন্ধু আমাদেরকে যখন জানাবে যে, হ্যাঁ, টাকাগুলো তাদের বিভিন্ন গন্তব্যে

পৌচেছে—পৌছতে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়, তার মানে ওই দিনই দুপুরে পৌছে যাবে—শুধু তখনই আমরা বিদায় নেব। জিম্মিরা অবশ্য আমাদের সাথেই যাবেন।'

'আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবেন?' জানতে চাইলেন জেনারেল পীল।

'আপনি খুব বিপজ্জনক মানুষ, কাজেই আপনাকে আমরা কোথাও নিয়ে যাচ্ছি না। প্রেসিডেন্ট আর তাঁর তিন মেহমান, ব্যস, বেশি ভিড় বাড়াতে চাই না। আপনাকে বলতে বাধা নেই, ক্যারিবিয়ানে আমার এক বন্ধু আছে—একটা স্বাধীন দ্বীপের আজীবন প্রেসিডেন্ট তিনি। দ্বীপটা স্বাধীন একটা দেশ, কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রকে পছন্দ করে না ওরা। ওই দেশের প্রেসিডেন্ট আমাদের খাতির যত্ন করার দায়িত্ব নিয়েছেন, প্রতি রাতের জন্যে দশ লাখ ডলার করে দিতে হবে।'

কবীর চৌধুরী থামতে এবারও কেউ কোন মন্তব্য করল না।

'একটা কথা বলা হয়নি,' আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'পরশু দিন থেকে শুরু হবে ফাইন ধরা। এই জরিমানা হবে ঘণ্টা হিসেবে। প্রতি ঘণ্টায় দুই মিলিয়ন ডলার।'

'সারা দুনিয়ায় আপনার সময়ই বোধহয় সবচেয়ে বেশি দামী?' দাঁতে দাঁত চেপে, চাপা গলায় জানতে চাইলেন ট্রেজারী সেক্রেটারি।

'যার সময়, দামটা তাকেই ঠিক করতে হয়,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আপনাদের কাছ থেকে টাকাটা আমি পেলে প্রমাণ হয়ে যাবে, আমার সময় সত্যি ওরকম দামী কিনা। আর কোন প্রশ্ন আছে?'

'আছে,' বললেন জেনারেল পীল। 'ওই দ্বীপে কিভাবে আপনি যেতে চান?'

'কিভাবে আবার, প্লেনে করে যাব। হেলিকপ্টারে চড়ে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যেতে লাগবে দশ মিনিট, ওখানে পৌছে প্লেনে চড়ব।'

'সব ব্যবস্থা তাহলে করা আছে? আপনাদের প্লেন অপেক্ষা করছে ওখানে?'

'প্লেন অবশ্যই অপেক্ষা করছে। তবে, প্লেনটা সে-কথা জানে না।'

'কি প্লেন?'

'এয়ারফোর্স ওয়ান। আপনাদের মহামান্য প্রেসিডেন্টের বাহন।'

জেনারেল পীলের মত অটল ব্যক্তিত্বও থতমত খেয়ে গেলেন। 'আপনি বলতে চাইছেন, প্রেসিডেনশিয়াল বোয়িং হাইজ্যাক করবেন?'

'আপনি কি আশা করেছিলেন প্রেসিডেন্টকে আমি ডিসি-থ্রীতে করে নিয়ে যাব? উনি আমার মেহমান হয়ে যাবেন, ওনার আরাম-আয়েশের দিকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে না? তারপর ওনাকে নিয়ে আমরা যখন আবার এই দেশের মাটিতে ফিরে আসব…'

'আমরা মানে?'

'প্রেসিডেন্ট, আমি এবং আমার দলবল।'

'আবার আপনারা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা ফেলার স্পর্ধা দেখাবেন?'

'অবশ্যই।'

'সেটা কিভাবে সম্ভব হবে? আইনের ভয় নেই?' জানতে চাইলেন সেক্রেটারি

অভ স্টেট।

'আপনি আমাকে নিরাশ করলেন,' বলল কবীর চৌধুরী। 'সুপ্রীম কোর্ট আর অ্যাটর্নি জেনারেলই শুধু আইন আর শাসনতন্ত্র সম্পর্কে জানে, এটা আমি আশা করিনি।' এদিক ওদিক তাকাল সে, যেন কারও কাছ থেকে এক-আধটা মন্তব্য আশা করছে। কিন্তু সবাই মুখে তালা এঁটে বসে আছেন। অগত্যা তাকেই আবার বলতে হলো, 'এই দেশের আইন বলে, একবার যদি কারও ওপর থেকে অভিযোগ তুলে নিয়ে তাকে ক্ষমা করা হয়, পরে আবার তাকে ওই একই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না বা ক্ষমা প্রত্যাহার করা যাবে না।'

কথাগুলোর সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে দশ সেকেন্ডের ওপর লেগে গেল। তারপর বিস্ফোরিত হলেন জেনারেল পীল। 'হোয়াট!'

দেশের জন্যে প্রয়োজনে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবেন ঘোষণা করে যে ক'জন ভোটারকে দলে টেনেছিলেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর এবারের আচরণে তাদের অর্ধেককে হারালেন তিনি।

'ব্যাটা বদমাশ!' প্রচণ্ড রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন প্রেসিডেন্ট। 'ইতর! নিঃশর্ত ক্ষমা চায়! উজবুক কাঁহিকা। ভেবেছিস...'

ডাক্তারকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী, 'হার্ট অ্যাটাক হলে, চিকিৎসা করার যন্ত্রপাতি সব রেডি তো? কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিট?'

ডাক্তারকে গম্ভীর দেখাল। 'এ নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।'

প্রেসিডেন্ট ঘেমে উঠেছেন। 'শয়তানের চেলা! মড়াখেকো শকুন! যদি ভেবে থাকিস...'

তাড়াতাড়ি প্রেসিডেন্টের পাশে চলে এসে তাঁর কানের কাছে ঝুঁকে পড়লেন জেনারেল পীল, বিড়বিড় করে বললেন, 'স্যার, আপনি টিভিতে রয়েছেন!'

মাঝপথে থেমে গিয়ে বোবা দৃষ্টিতে জেনারেলের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, তারপর চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড ধ্যান করে নিয়ে নতুন সুরে শুরু করলেন, 'আমি, ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার চীফ একজিকিউটিভ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই হীন ব্ল্যাকমেইল, এই জঘন্য অন্যায় আবদার আমি কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে রাজি নই। আমেরিকার জনগণ এটা মেনে নেবে না। গণতন্ত্র এটা মেনে নেবে না। পরিণতি যাই হোক না কেন, আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাব...'

'কিভাবে?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

উত্তর দেবার জন্যে দু'সেকেন্ড চিন্তা করলেন প্রেসিডেন্ট, কিন্তু মাথায় কোন উত্তর গজাল না। তবু বললেন, 'ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সীগুলো তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে, সশস্ত্র বাহিনী তার সবটুকু ওজন নিয়ে, আমাদের জনগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মহান চেতনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে...'

'কোথায়? কার ওপর?'

'তার আগে আমার কেবিনেটের সিনিয়র সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসব আমি...'

'ওসব ধানাইপানাই বাদ দিন। গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করার অনুমতি আপনাকে দেয়া হবে না। নিঃশর্ত ক্ষমা। তা না হলে ওই দ্বীপে আপনার নির্বাসন

প্রলম্বিত হবে। বলে রাখা ভাল, এটা কিন্তু সশ্রম নির্বাসন। ওখানে আপনাকে খেতে কাজ করে নিজের খাবার যোগাড় করতে হবে। বসে বসে খাবেন, সেটি হবে না।' বাদশার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'বাদশা মিঞার বয়স হয়েছে, কিন্তু আমি দুঃখিত, তাঁকেও খেটে খেতে হবে। জঙ্গলে গিয়ে রোজ গাছ কাটতে হবে তাঁকে।'

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'আপাতত।' কবীর চৌধুরী ইশারা করে ক্যামেরাম্যানকে জানাল, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

'আমি কি বাদশা, প্রিন্স, আমার কলিগ আর পুলিস চীফের সাথে দুটো কথা বলতে পারি?'

'তাতে যদি সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে বলে মনে করেন, পারেন।'

'গোপনে?'

'বেশ।'

'আমার কোচে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমরা ছাড়া কেউ সেখানে থাকবে না।'

'বাইরে গার্ড থাকবে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কোচটা তো সাউন্ডপ্রুফ।'

প্রেসিডেন্ট তাঁর লোকজন নিয়ে কোচে গিয়ে উঠলেন। এক সেকেন্ড পর হাত-ইশারায় বেডলারকে কাছে ডাকল কবীর চৌধুরী। জানতে চাইল, 'প্রেসিডেনশিয়াল কোচে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করেছ তো?'

'জ্বী।'

'ওরা গোপন আলোচনায় বসছে। তোমার একটু বিশ্রাম দরকার না? যাও না, আমাদের কোচে গিয়ে একটু জিরিয়ে নাও।'

'এই যাচ্ছি, স্যার।' হন হন করে এগোল বেডলার। কবীর চৌধুরীর কোচে উঠে ড্রাইভারের সীটে বসল সে। কনসোলের একটা বোতামে চাপ দিয়ে কানে তুলল এয়ার-ফোন। প্রতিটি আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, সন্তুষ্ট হয়ে আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে। চালু হয়ে গেল টেপ রেকর্ডার।

'এই বীরপুরুষ সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি?' রানাকে জিজ্ঞেস করল জুলি।

'কবীর চৌধুরী সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে আমি বীরপুরুষ বলি না।'

'কিন্তু তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, ভদ্রলোকের বুকের পাটা আছে...'

'দেখতে পাচ্ছ না, আমি চিন্তা করছি? সকালে কি বলেছিলাম, মনে নেই? আমাকে খামচাবে না, আর কথা একটু কম বলবে।'

জুলি গুম হয়ে গেল।

খানিক পর রানা বলল, 'হয়েছে।'

'কি হয়েছে?' সবুজ চোখ তুলে তাকাল জুলি।

'চিন্তা করে ঠিক করে ফেলেছি, কি করব।'

রানার হাতটা খামচে ধরেই ছেড়ে দিল জুলি। 'আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি

না!'

'তাহলে জিজ্ঞেস করি, কখনও অসুস্থ হয়েছ তুমি?'

'কেন হব না। মাঝেমধ্যে সবাই হয়।'

'গুরুতর অসুস্থ? হাসপাতালে যেতে হয়েছিল?'

'না। তা যেতে হয়নি।'

'খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে। অবশ্য এখনও যদি সাহায্য করার ইচ্ছে তোমার থাকে, তবেই।'

'তুমি যদি বলো, যাব। বলেছি তো, যে-কোন ঝুঁকি নেব আমি। শর্ত একটাই, আমার সমস্ত ভয় তুমি ভেঙে দেবে।'

'আমার সাথে একা কোথাও যাবার ভয়, সেটাও? আমার সাথে আমার অ্যাপার্টমেন্টে, ডিনারের পর, মানে···সেটাও কি?'

'তুমি একটা স্বার্থপর!'

'কাজের কথা। জানো তো, তুমি যদি ধরা পড়ে যাও, কবীর চৌধুরী তোমার কাছ থেকে কথা আদায় করবে। কথা বলাবার অনেক উপায় জানা আছে তার। খুব কষ্ট পাবে তুমি।'

'যদি সব কথা গড় গড় করে বলে দিই?'

'আমি তাহলে ফেঁসে যাব।'

'তাতে আমার কি!' চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল জুলির, অন্তত তাই মনে হলো রানার। তারপর ভাবল, চোখের ভুল।

'ভেবে দেখো।'

'কিন্তু ধরা আমি পড়ব কেন?' জানতে চাইল জুলি। 'কি করতে গিয়ে ধরা পড়ব?'

'আমার একটা চিঠি ডেলিভারি দিতে গিয়ে,' বলল রানা। 'কয়েক মিনিট আমাকে একটু একা থাকতে দেবে, প্লীজ।'

ক্যামেরা রেডি করে কিছু স্টীল শট নিল রানা। কোচ, হেলিকপ্টার, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান এবং প্রহরী, কিছুই বাদ দিল না। বেশিরভাগ ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্রিজের দক্ষিণ টাওয়ার আর সান ফ্রান্সিসকোর আকাশ রেখা ধরে রাখার চেষ্টা করল ও। তারপর ক্যামেরা ফেরাল অ্যাম্বুলেন্স আর ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তারকে দেখে গম্ভীর বলে মনে হলেও, আসলে যে রসিক সেটা তার কথা শুনে বোঝা গেল। রানাকে বলল সে, 'ও, বুঝেছি, আমাকে বিখ্যাত করার মতলব।'

হেসে ফেলল রানা। 'ষড়যন্ত্র বলেননি, সেজন্যে ধন্যবাদ।'

'আমি কবীর চৌধুরী নই,' বলল ডাক্তার। 'লোকটা দারুণ সন্দেহপ্রবণ। আমাকে দু'বার শাসিয়ে গেছে। বলেছে, তার বিরুদ্ধে কেউ কোন ষড়যন্ত্র করলে ব্রিজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

ছবি তোলা শেষ করে রানা জানতে চাইল, 'গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কোন মন্তব্য আছে?'

'কোন্ কাগজে ছাপা হবে?'

'লন্ডনের দ্য নিউজে।'

'আমার একটাই মন্তব্য—সুযোগ পেলে এই শয়তানের হাত থেকে প্রেসিডেন্টকে অন্তত বাঁচাব আমি।'

'শুধু প্রেসিডেন্টকে?'

হেসে ফেলল ডাক্তার। 'আসলে ওটা আমার প্রতিজ্ঞা নয়, অক্ষম আশা। জানি, কাউকে বাঁচাবার সুযোগ পেলেও সেটা ব্যবহার করার মত বুদ্ধি বা সাহস আমার নেই।'

'আমি জানতে চাইছিলাম···'

'প্রেসিডেন্টের কথা বললাম এই জন্যে যে আমরা একই রাজ্যে জন্মেছি. ভোটও দিয়েছি তাঁকে।'

'আপনি তাহলে তাঁকে সাহায্য করতে চান?' নোটবুকে খস খস করে উত্তর লিখছে রানা। 'সুযোগ পেলে করবেন?'

'বললাম তো, অত সাহস আমার নেই।'

'হয়তো আছে, জানেন না। কিংবা সুযোগ এলে তখন সাহসও হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার। 'কি জানি!'

'যদি বলি, প্রেসিডেন্ট নয়, আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমি প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করব, তাহলে?'

রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ডাক্তার। 'কি বললেন?'

'যদি একই পথের পথিক হতে চান, তাহলে আরও আলোচনা হতে পারে।'

'আপনার পরিচয়? যোগ্যতা?'

'ইউনাকোর নাম শুনেছেন?'

'না।'

'আমি একজন এজেন্ট,' বলল রানা। 'আন্তর্জাতিক অপরাধ দমনের সাথে জড়িত।'

'পরিচয়পত্র আছে?'

'বোকার মত হয়ে গেল না প্রশ্নটা? সিক্রেট এজেন্টরা সাথে কার্ড রাখে না।'

'আপনি এশিয়ান?'

'বাংলাদেশী।'

আরও একশো একটা প্রশ্ন করল ডাক্তার। বিরক্ত না হয়ে তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিল রানা।

'ধরে নিন,' সবশেষে বলল ডাক্তার, 'আছি আপনার সাথে। কিন্তু কি করতে চান শুনি?'

'একজন মহিলা ফটোগ্রাফার আছেন, জুলি···'

'আর বলতে হবে না, সবুজ চোখ তো? যাকে দেখলেই বুকে চোট লাগে···'

'আমি চাই,' বলল রানা, 'আমার একটা মেসেজ নিয়ে শহরে যাবে ও। দু'ঘণ্টার মধ্যে উত্তর নিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে ওকে। মেসেজটা কোড করা হবে, সেটার ছবি তোলা হবে, তারপর স্পুলটা দেয়া হবে আপনাকে। একটা সিগারেটের অর্ধেক, আপনার কোন একটা টিউব বা কার্টুনে লুকিয়ে রাখতে কোন

অসুবিধে হবে না। শহরে যাবার সময় ওই কার্টুন বা টিউবটাও সাথে রাখবেন আপনি। আপনি একজন ডাক্তার, সহজে কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না।'

'শুনতে খুব সহজই লাগছে...'

'আসলেও তাই, যদি সাহস থাকে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দুই সেক্রেটারি আর পুলিস চীফ ব্রিজ থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। ইতিমধ্যে, আমি আশা করছি, এফ.বি.আই.চীফ আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর সাহায্য আমার একান্ত দরকার হবে।'

চারদিকে তাকাল ডাক্তার। ওদেরকে বিশেষ ভাবে কেউ লক্ষ্য করছে না।

'মেডিকেল কিট, হার্ট ইউনিট, অক্সিজেন কিট ছাড়া আরও সফিসটিকেটেড কিছু আছে আপনার কাছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল ডাক্তার।

'তার মানে রেডিয়োলজিকাল গিয়ার কিংবা ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেটিভ ইকুইপমেন্ট নেই, এবং বোধহয় অপারেশন করার সুযোগেরও অভাব রয়েছে। কাজেই, মিস জুলি অসুস্থ হয়ে পড়লেই আপনি ডাক্তার হিসেবে পরামর্শ দিয়ে বলবেন, এই মুহূর্তে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। রোগটা কি হবে, আপনি জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।'

'কিন্তু রোগের লক্ষণ থাকতে হবে না? চৌধুরীকে খবর দেবার আগে অন্তত পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় চাই আমি। সুন্দরীকে একটা ইঞ্জেকশন দেব।'

একটু চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'ওর সব কিছুতেই বড় ভয়। ব্যথা পাবে শুনলে যদি বেঁকে বসে তবেই হয়েছে। দেখি।'

জুলির কাছে ফিরে এল ও। ডাক্তার সাহায্য করতে রাজি হয়েছে শুনে জুলির প্রথম প্রশ্ন হলো, 'কার জন্যে রাজি হলো? তোমার, না আমার জন্যে?'

'মানে?'

'পুরুষমানুষের চোখ দেখলেই বলে দিতে পারি কি চায়,' ফিসফিস করে বলল জুলি। 'আমাকে দেখে এমন বেহায়ার মত তাকিয়ে থাকেন ভদ্রলোক...'

'উনি একজন ডাক্তার, নিখুঁত একটা শরীর দেখলে তাকিয়ে তো থাকবেনই। তুমি সুন্দরী, সেটা তাঁর দোষ নয়।'

'কথার রাজা, সন্দেহ নেই। এই, তোমার জন্যে আমি কি একটা মিনি ট্র্যানসিভার রেডিও আনব?'

'এই তো, বুদ্ধি খুলছে। কিন্তু না, ওটা আমার ক্যামেরার তলার দিকে লুকানো আছে। কিন্তু ভিলেনের কোচের মাথায় ওই চাকতিটা ঘুরতে দেখেছ? জানো ওটা কি? অটোমেটিক রেডিও-ওয়েভ স্ক্যানার। আমার সেট চালু হবার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে টের পেয়ে যাবে ওরা। এবার, মন দিয়ে শোনো কি করতে হবে।'

রানার বলা শেষ হতে জুলি মাথা দুলিয়ে বলল, 'বুঝলাম। সব ঠিকই আছে, পারব। কিন্তু ইঞ্জেকশনটা কি না নিলেই নয়?'

'বেয়নেট বা পেরেক নয় সামান্য একটা সূঁচ, খুব লাগবে না।'

'ডাক্তারের বদলে ইঞ্জেকশনটা তুমি আমাকে পুশ করতে পারো না?'

'সেটা অন্যায় হবে। যার কাজ তাকেই করতে দেয়া উচিত। তাছাড়া, ব্যথা

পাও এমন কিছু তোমার শরীরে আমি ঢোকাতে পারব না। ওটি আমাকে মাফ করতে হবে।'

রানার কথার গভীর কোন অর্থ আছে কিনা বোঝার জন্যে চোখ কুঁচকে উঠল জুলির। কিন্তু সুযোগটা না দিয়ে ওখান থেকে সরে এল রানা।

অলস পায়ে প্রেস কোচের দিকে এগোল ও। প্রেসিডেনশিয়াল কোচের ভেতর বিতর্কের ঝড় উঠেছে, বোঝা গেল কাঁচের ওদিকে কর্মকর্তাদের হাত আর মুখ নাড়ার বহর দেখে। তাঁরা যে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না, সেটাও পরিষ্কার। রিয়্যার কোচে রয়েছে বেডলার আর কবীর চৌধুরী। দেখে মনে হলো, দু'জনেই ঢুলছে। সদ্য আঁকা রেখা দুটোর ভেতর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সশস্ত্র প্রহরীরা। নিউজ মিডিয়ার লোকজন ভিড় করে আছে এখানে সেখানে। প্রেস কোচে উঠে পড়ল রানা। খালি, কেউ নেই। নিজের সীটে বসে ক্যামেরা নামিয়ে রাখল ও। ব্যাগ থেকে প্যাড আর ফেল্ট পেন বের করে লেখার কাজ শুরু করল। কোড-বুক নেই, কিন্তু তাতে ওর কোন অসুবিধে হলো না। সব মুখস্থ আছে। এই কোডের পাঠোদ্ধার করা যুক্তরাষ্ট্রে শুধু দু'জনের পক্ষে সম্ভব। একজন এফ.বি.আই.চীফ। অপরজন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

আট

এফ.বি.আই.চীফ জেনারেল ফিদার হোপ ছোটখাট মানুষ, বয়স ষাটের ওপর। তিনি কথা বলেন কম, চিন্তা করেন বেশি। ঘটনাটার প্রাথমিক রিপোর্ট পাবার পর সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করেছেন তিনি। এফ.বি.আই. প্রেসিডেন্ট এবং সম্মানীয় মেহমানদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, কথাটা তিনি অকপটে স্বীকার করলেন। এবং সেই সাথে প্রস্তাব দিলেন পদত্যাগের। টেলিফোনে প্রস্তাবটা পৌঁছে গেল ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেভিড ল্যাংফোর্ডের কাছে। ল্যাংফোর্ড এক কথায় পদত্যাগ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অগত্যা জরুরী মীটিঙে যোগ দিতে হয়েছে জেনারেল ফিদার হোপকে। কিন্তু পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন তিনি, আলোচনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করছেন না।

জরুরী বৈঠকে আরও একজন ব্যক্তিত্ব অংশ নিচ্ছেন। তিনি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। বৃদ্ধ হয়েছেন ভদ্রলোক, কিন্তু শরীরটাকে এখনও ভেঙে পড়তে দেননি। দেখতে ঠিক যেন দুর্ধর্ষ এক কাউবয়, কাপড়চোপড়ও পরেন রঙচঙে। তারুণ্য যেন এখনও তাঁকে ত্যাগ করে যায়নি।

অ্যাডমিরাল সোরেনসন আর জেনারেল গারল্যান্ড, দু'জনই তাঁর বন্ধু মানুষ। তাঁরা দু'জনেই লম্বা, কিন্তু একজন মোটা, অপরজন রোগা। জেনারেল গারল্যান্ড মোটা হবার কারণ, খাওয়াদাওয়ার প্রতি তাঁর অতিশয় দুর্বলতা।

প্রস্তাবগুলো শুনে মুখ বাঁকা করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, বললেন, 'এসবে কাজ হবে না। তোমরাও তা জানো।'

'এই পরিস্থিতিতে আমরা অসহায়, জর্জ,' অ্যাডমিরাল সোরেনসন বললেন, 'আমি বা জেনারেল, আমরা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের লোক, যা এখানে কাজে লাগবে না। তোমার কোন প্রস্তাব থাকলে বলো শুনি।'

'আমি তো এইমাত্র এলাম। এই মুহূর্তে কিছু করবার কথা ভাবছ তোমরা?'

জেনারেল গারল্যান্ডকে অসহায় দেখাল। মুহূর্তের জন্যে বাদাম চিবানো বন্ধ করে তিনি বললেন, 'না। আমরা ভাইস-প্রেসিডেন্টের জন্যে অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করছি সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীর জন্যেও।'

'ওরা যদি ছাড়া পায়।'

'জেনারেল ফিদার হোপের ধারণা কবীর চৌধুরী ওকে ছেড়ে দেবে,' বললেন গারল্যান্ড। যুদ্ধজাহাজের সাহায্যে পাঠানো রানার মেসেজটা তুলে নিলেন তিনি, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, 'দেখো তো, এই মেসেজটার ওপর কতটুকু ভরসা রাখা যায়?'

মেসেজটা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন হ্যামিলটন।

'প্লীজ, অপেক্ষা করুন। কোন রকম সরাসরি অ্যাকশন নেবেন না। কোন রকম ভায়োলেন্স নয়, আই রিপিট, কোন রকম ভায়োলেন্স নয়। পরিস্থিতিটা আমাকে বুঝতে দিন। ট্র্যানসিভার ব্যবহার করতে পারছি না। আজ বিকেলে আবার যোগাযোগ করব। মাসুদ রানা।'

'মাই গড!' আনন্দে একরকম লাফিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'রানা ওখানে!'

'কে এই মাসুদ রানা, জর্জ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন জেনারেল গারল্যান্ড।

'অদ্ভুত এক যুবক,' পাইপে আগুন ধরিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'স্বাধীনচেতা, তীক্ষ্ণধী, সুবিবেচক, সতর্ক, অ্যাকটিভ, মেজাজী, নিষ্ঠুর, কর্তৃত্ব মানতে চায় না—বলতে পারো আমারই নবীন সংস্করণ।'

'খুব একটা উৎসাহ বোধ করার মত নয়, কি বলো? মাথা গরম একটা ছোকরা এই পরিস্থিতিতে কি করতে পারবে? দরকার ঠাণ্ডা মাথার...'

জেনারেল গারল্যান্ডকে থামিয়ে দিয়ে হ্যামিলটন বললেন, 'রানা সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। তেজী বটে, কিন্তু ওর মত ঠাণ্ডা হওয়াও আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বলতে ভুলে গেছি, ও একটা সত্যিকার প্রতিভা। সবচেয়ে বড় যে গুণ, কোন কাজকে অসম্ভব বলে মনে করে না।'

'কবীর চৌধুরীকে সামলাতে পারবে, সে-যোগ্যতা কি তার আছে?' অবশেষে জানতে চাইলেন জেনারেল গারল্যান্ড।

'এর আগে প্রতিবার তো রানাই ওকে কোণঠাসা করেছে।'

'কিন্তু আজ বিকেলে যোগাযোগ করবে কিভাবে?'

'জানি না,' বললেন হ্যামিলটন। 'পারবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একবার তো পেরেছে, তাই না?'

প্রেসিডেনশিয়াল আর রিয়্যার কোচের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে

পায়চারি করছে কবীর চৌধুরী। উত্তেজিত বা অস্থির নয়, সম্পূর্ণ শান্ত সে। পায়চারি থামিয়ে হাতঘড়ি দেখল একবার। তারপর এগোল প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দরজার দিকে।

দরজা খুলে কোচে উঠল সে। তাকে দেখে বন্দীরা সবাই চুপ হয়ে গেলেন।

'সিদ্ধান্ত হলো?' জানতে চাইল সে। কেউ কথা বললেন না। 'তার মানে কি আপনারা সবাই স্বেচ্ছা নির্বাসনে যেতে চাইছেন?'

জিন আর মার্টিনি ভরা লম্বা গ্লাসটা ধীরে ধীরে সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখলেন প্রেসিডেন্ট। 'সিদ্ধান্ত নিতে আরও সময় লাগবে আমাদের।'

'যত খুশি সময় নিন,' সহাস্যে বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু জরিমানার কথাটা আবার ভুলে যাবেন না। ঘণ্টায় বিশ লাখ ডলার।'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'শুনতে আপত্তি নেই।'

'জিম্মি হিসেবে আমি থাকলাম, বাদশা আর প্রিন্সকে ছেড়ে দেয়া হোক...'

হাত তুলে বাধা দিল কবীর চৌধুরী। 'থাক, থাক, আর শুনতে চাই না।' দুই সেক্রেটারির দিকে ফিরল সে। তারপর তাকাল পুলিস চীফের দিকে। 'আপনারা বিদায় হোন।' বলে কোচ থেকে নেমে এল সে।

কবীর চৌধুরীর পিছু পিছু বাকি তিনজনও নেমে এলেন। তাঁদের চলে যাওয়াটা প্রেসিডেন্ট চাক্ষুষ করলেন না, পানীয় ভরা গ্লাসের ভেতর তাকিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন দেখছেন তিনি।

কোচ থেকে নেমে এসে পেরটের সাথে কথা বলল কবীর চৌধুরী। 'টিভি ভ্যান আর ক্রুদের আবার এদিকে নিয়ে এসো। টিভি কোম্পানিগুলোকেও খবর দাও।'

'ঠিক আছে, চীফ,' বলল পেরট। 'আপনি...?'

'এদেরকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।'

'আপনি কেন যাবেন, চীফ? আরও তো লোক আছে।'

'তা নয়। ব্যারিয়ার তৈরির কাজ কতটুকু এগোল দেখে আসতে চাই। হাঁটা থেকে রেহাই পাব, এই আর কি।'

পুলিস কারে উঠল ওরা।

প্রেস কোচে এখনও একা রয়েছে রানা। পুলিস কার নিয়ে ওদেরকে চলে যেতে দেখল ও, তারপর আবার মনোযোগ দিল হাঁটুর ওপর পড়ে থাকা তিন প্রস্থ নোটপেপারের দিকে। পোস্টকার্ডের চেয়ে আকারে একটু ছোট হবে কাগজগুলো, তিনটেই ঝরঝরে লেখায় ভরাট, অক্ষরগুলো খুদে, ভাষাটা দুর্বোধ্য। ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে প্রতিটি কাগজের তিনটে করে ছবি তুলল ও। তারপর এক এক করে তিনটে কাগজই পুড়িয়ে ফেলল। ছাইদানীতে ফেলে আঙুল দিয়ে একটু নাড়তেই গুঁড়িয়ে গেল কালো ছাই। এবার ক্যামেরা থেকে স্পুল বের করে ওটাকে সীল করল রানা, খুব পাতলা লীড ফয়েল দিয়ে মুড়ল। ডাক্তারকে যেমন বলেছে, আকারে আধখানা সিগারেটের চেয়ে বড় হলো না।

ক্যামেরা রিলোড করে বাইরে বেরিয়ে এল ও। কি হয় না হয় এই রকম একটা

ভাব চারদিকে। একজন রিপোর্টারকে কাছে ডেকে ব্যাপারটা কি জানতে চাইল ও।

'মি. চৌধুরী এইমাত্র আবার টেলিভিশন ভ্যান আনতে লোক পাঠিয়েছেন।'

'কেন জানো?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিপোর্টার। 'কি করে বলব!'

এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে এক ডজন ছবি তুলল রানা। এক সময় দেখা গেল অ্যাম্বুলেন্সের কাছে চলে এসেছে ও। অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাক্তার। নিজের পকেট হাতড়াল রানা, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। জিজ্ঞেস করল, 'এই যে, ডাক্তার, আপনার কাছে সিগারেট হবে নাকি?'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে রানাকে দিল ডাক্তার।

'আগুন?'

পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল ডাক্তার, মুখে সিগারেট নিয়ে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। সিগারেটে আগুন ধরাবার সময় স্পুলটা হাতবদল হয়ে গেল।

'ধন্যবাদ, ডাক্তার,' অলস দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল রানা। ওদের কথা শুনতে পাবে এত কাছে নেই কেউ। 'লুকিয়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগবে?'

'এক মিনিট। কোথায়, ঠিক করে ফেলেছি।'

'দু'মিনিটের মধ্যে রোগিনী পেয়ে যাবেন।'

ডাক্তার তার অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর গিয়ে ঢুকল, রানাও ধীর পায়ে হেঁটে চলে এল জুলির কাছে। কাছেপিঠে কেউ নেই, একা দাঁড়িয়ে ছিল জুলি···এধরনের একটা পরিবেশ অর্জন করা খুবই কঠিন তার জন্যে। রানার দিকে তাকাল সে, ঠোঁট ভেজাল, চেষ্টা করল হাসতে। চেষ্টাটা যে খুব একটা ফলবতী হলো তা নয়।

'ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, উনি কে?' জানতে চাইল রানা। 'চেহারা দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে না, কোন মেয়ে বিপদে পড়লে উনি সাহায্য করবেন, অথচ অন্যায় কোন সুযোগ নেবেন না?'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল জুলি। বলল, 'উনি বিল গাইডেন—এ. পি.। চমৎকার ভদ্রলোক।'

'যাও, ওর গায়ে গিয়ে ঢলে পড়ো। সব কিছুই বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত। গোটা ব্যাপারটাই অভিনয়, কিন্তু খুঁত থাকলে চলবে না। রসো, আগে আমাকে ব্রিজের ওই ওদিকে সরে যেতে দাও। তুমি অসুস্থ হবার সময় নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাই আমি।'

রাস্তা পেরিয়ে ব্রিজের আরেক দিকে চলে এসে ঘুরল রানা। এরই মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে হাঁটা শুরু করেছে জুলি। তার পা ফেলার ভঙ্গি একটু যেন আড়ষ্ট লাগল। ব্যাপারটা অভিনয়েরই অংশ নাকি ভয় পাওয়ার ফল, ঠিক ধরতে পারল না রানা। তবে অভিনয় হবার সম্ভাবনাই বেশি—চালু মেয়ে।

জুলি পনেরো ফিট দূরে থাকতে তাকে প্রথম দেখতে পেল বিল গাইডেন। চোখ পড়ল, সে-চোখ আর ফেরাতে পারল না। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা, একটা হাত তুলে নেড়েও দিল একবার। লক্ষ্য করল, সুন্দরীর হাঁটাটা

যেন কেমন। প্রথমে কৌতূহল বোধ করল সে। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করল মুখের হাসি। দু'পা সামনে বাড়ল, হাত বাড়িয়ে জুলির কাঁধ দুটো ধরে ফেলল। চেহারা দেখে মনে হলো, কাউকে ধরার সুযোগ পেয়ে জুলি যেন বেঁচে গেছে। বিল গাইডেন অনুভব করল, জুলির একটা হাত তার কাঁধ খামচে ধরল। 'এই মেয়ে, কি ব্যাপার?' জুলির চেহারা ব্যথায় কুঁচকে উঠতে দেখে অস্থির হয়ে উঠল সে।

'ব্যথা!' তারপরই গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল জুলির গলা থেকে। 'আমি··· বোধহয়···হার্ট অ্যাটাক···যাচ্ছি···মারা যাচ্ছি···' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জুলি।

'হার্ট অ্যাটাক? কি করে জানলে?' একটু হেসে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল গাইডেন। 'তাছাড়া, খামচে ধরেছ ডান দিকটা, তোমার হার্টটা কি ওদিকে? প্লীজ, আমাকে ভুল বুঝো না।' জুলিকে ধরে পা বাড়াল সে। 'এসো। কাছেই ডাক্তার আছে।'

দূর থেকে ওদেরকে অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা। যতদূর বুঝতে পারল, জুলির অভিনয় ও শুধু একাই দেখল।

দক্ষিণ ব্যারিয়ার অর্ধেক তৈরি হয়ে গেছে। কাজ যেভাবে এগোচ্ছে, দেখে খুশিই হলো কবীর চৌধুরী। পায়ে হেঁটে ফিরে এল সে। রিয়্যার কোচে চড়ে বেডলারের পাশের সীটে বসল।

'ওদের আলোচনা থেকে আর কিছু জানা গেল?'

'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বারবার বলে, স্যার,' রিপোর্ট করল বেডলার। 'একঘেয়ে ব্যাপার। টেপ শোনেন, কিন্তু কিছু পাবেন না।'

'তারচেয়ে তোমার মুখ থেকেই শুনি।'

'পেমেন্টের ব্যাপারটা নিয়ে এখনও তর্ক করছে ওরা।'

'দেবে তো?'

'দেবে না মানে! কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এখনই দেবে, নাকি এটা সেটা নানা অজুহাত দেখিয়ে সময় নেবে। ভোটও হয়েছে। চারজন এখুনি পেমেন্ট দেয়ার পক্ষে, দু'জন বিপক্ষে, দু'জন কোন সিদ্ধান্ত জানাতে পারেনি। বাদশা, প্রিন্স আর তেল মন্ত্রী শেখ খায়ের, এরা তিনজন প্রথম থেকেই বলে আসছে, টাকা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিপদমুক্ত হওয়া দরকার। এদের দলে মেয়রও রয়েছে।'

'মেয়রও তাই চাইবেন, জানা কথা। যত টাকাই লাগুক, তার কাছে ব্রিজের নিরাপত্তা আগে।'

'প্রেসিডেন্ট আর স্টিফেন বেকার টাকা দেয়ার ঘোর বিরোধী,' বলল বেডলার। 'আন্ডার সেক্রেটারি জেমস ফেয়ার আর জেনারেল পীল কোন সিদ্ধান্ত দেয়নি। তবে জেনারেল সংগ্রাম করে মরে যাওয়াটাকেই ভাল বলে মনে করছে।'

'প্রেসিডেন্টের দেরি করতে চাওয়ার কারণটা বুঝি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ওয়েট অ্যান্ড সী, রাজনীতিক হিসেবে লোকটা এই নীতির অনুসারী। ভাবছে, দেরি করলে একটা হয়তো মিরাকল ঘটবে। সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার, এত টাকা

তার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেলে ভোটাররা ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখবে না। রেকারের ব্যাপারটাও বোঝা যায়। এই লোক জীবনে কখনও স্বাধীনভাবে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। প্রেসিডেন্টের দেখাদেখি বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ঠিক আছে, ওদের মাথাব্যথা ওরাই সারাক।' হুয়ানকে কোচে উঠতে দেখে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে?'

'তেমন কিছু না, স্যার। মনে হলো ডাক্তার সাহেব এক রোগীকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছেন। আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন তিনি।'

অ্যাম্বুলেন্সে উঠে কবীর চৌধুরী দেখল, সবুজ নয়না জুলি ঝুলন্ত একটা সাইড বেডে শুয়ে আছে, তার বুক আর পেটের মাঝখানটা, ইঞ্চি ছয়েক, খোলা।

রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে দেখাল জুলিকে। কবীর চৌধুরী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল ডাক্তারের দিকে। অসুস্থদের মাঝখানে অস্বস্তি বোধ করে সে। জুলি যে অসুস্থ, তা সে দেখেই বুঝতে পারল।

'কি হয়েছে ওর?'

'সাংঘাতিক অসুস্থ, মি. চৌধুরী!' উদ্বিগ্ন দেখাল ডাক্তারকে। 'এখুনি ওকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছি, কি হয়েছে?'

'দেখুন না, ওর মুখ দেখুন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জুলির দিকে আরেকবার তাকাল কবীর চৌধুরী। দেখল, মুখের রঙ ছাই ছাই। কিন্তু জানল না, গন্ধহীন পাউডার মাখিয়ে এই ধূসর রঙ তৈরি করা হয়েছে।

'এবার, ওর চোখ দুটো দেখুন।'

জুলির চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, কিন্তু দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা।

'এবার, পালস দেখুন।'

অলস হাতে জুলির কব্জি ধরল কবীর চৌধুরী। ধরেই ছেড়ে দিল। 'বাপরে! সাংঘাতিক লাফাচ্ছে!'

সত্যি তাই। আসলে, এই একটি ক্ষেত্রে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে ডাক্তার। জুলি যখন অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকল, তখনই লাফাচ্ছিল তার পালস্। ইঞ্জেকশনটা না দিলেও চলত।

'এবার, মি. চৌধুরী, দয়া করে ওর তলপেটের ডান দিকে একটা হাত রাখুন, প্লীজ।'

'না, কোথাও হাত-টাত দিতে পারব না।'

'পেইনকিলার দিয়েছি, তাই চেঁচাচ্ছে না,' বলল ডাক্তার। 'অ্যাপেনডিক্সটা হয়তো ফুলে ঢোল হয়ে আছে, যে-কোন মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে। হতে পারে পেরিটনাইটিস। লক্ষণ বলতে গেলে সবগুলোই উপস্থিত। হাসপাতাল...'

'কেন, হাসপাতালে কেন? এখানে চিকিৎসা করতে অসুবিধে কোথায়?'

'কিসের চিকিৎসা করব, মি. চৌধুরী? রোগটাই তো ধরতে পারছি না। ডায়াগনস্টিক ইকুইপমেন্ট নেই। এক্সরে ফ্যাসিলিটি নেই। যদি অ্যাবডোমিন্যাল

সার্জারীর দরকার হয়. অপারেশন থিয়েটার কোথায়? তাছাড়া. অ্যানেসথেটিস্ট কোথায় পাব?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'হাসপাতাল ছাড়া উপায় নেই. মি. চৌধুরী।'

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল জুলি. হঠাৎ তার চোখের ঘোলাটে ভাব খানিকটা কমে এল। হাত তুলে সামনেটা হাতড়াল সে. নাগালের মধ্যে পেয়ে খামচে ধরল ডাক্তারের কনুই। তারপর একটা ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল বিছানার ওপর। 'না! মরে গেলেও হাসপাতালে যাব না আমি! মি. চৌধুরী. আমাকে আপনি এই ডাক্তারের হাত থেকে বাঁচান! হাসপাতাল. মাগো! ওরা আমাকে কাটাছেঁড়া করবে! মরি এখানে মরব. হাসপাতালে আমি মরতে যাব না।'

জুলির কাঁধ ধরে জোর খাটাল ডাক্তার. শুইয়ে দিল আবার।

'তাছাড়া. ব্যাপারটা যদি সত্যি সিরিয়াস কিছু না হয়? এটা যদি শুধু মাসল পেইন হয়? মি. চৌধুরী আমাকে আর ব্রিজে ফিরে আসতে দেবেন না। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় খবরের. আসল অংশটাই মিস্ করব আমি। এ ধরনের ঘটনার মাঝখানে জীবনে কখনও পড়ব আর? না. মরে গেলেও হাসপাতালে যাচ্ছি না।'

'তোমার ওটা মাসল পেইন নয়,' গম্ভীর মুখে বলল ডাক্তার। 'তুমি কি আমার চেয়ে বেশি বোঝো?'

'সিরিয়াস কিছু না হলে আবার তুমি ফিরে আসতে পারবে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু আমি আর ডাক্তার যা বলব তা যদি শোনো।' ইঙ্গিতে দরজাটা ডাক্তারকে দেখিয়ে ধাপ বেয়ে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে এল সে।

ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামতেই প্রশ্নের মুখে পড়ল। 'ব্যাপারটা আসলে কি, ডাক্তার?'

চেহারা দেখে মনে হলো ডাক্তারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে যাচ্ছে। 'আমি সোজা সরল লোক, খোলামেলা কথা বলতে পছন্দ করি। যদি ভাবেন আমি উপদেশ দিচ্ছি, সেটা আমার দুর্ভাগ্য।'

'উপদেশ তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু বক্তৃতা একেবারেই অসহ্য!' বোঝা গেল কবীর চৌধুরী রেগে যাচ্ছে।

'সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার, তাই না? ওই টাকা নিয়ে যদি নিরাপদে কেটে পড়তে পারেন, বিশ্বাস করুন, আমেরিকার লোক, সারা দুনিয়ার লোক, আপনাকে রূপকথার নায়ক ভেবে চুপি চুপি পুজো করবে। জ্বী, স্যার, মানুষের নেচারের মধ্যেই এই জিনিসটা রয়েছে। কিন্তু, আপনার জেদ বা গাফিলতির জন্যে এই সুন্দরী মেয়েটি যদি প্রাণ হারায়, সব ভেস্তে যাবে। যাদের কাছে আপনি রূপকথার নায়ক হতে পারতেন তারাই আপনাকে ঘৃণা করবে। তারা আপনাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তারা আপনাকে উপযুক্ত শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না।'

একজন ডাক্তারের কাছ থেকে এসব কথা শুনবে বলে আশা করেনি কবীর চৌধুরী। কিছুটা অবাক হলো সে। বলল, 'আমাকে থ্রেট করার দরকার নেই, ডাক্তার। আপনার রোগিনী হাসপাতালে যাক. তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি জানতে চাইছিলাম, ওর আসলে হয়েছেটা কি?'

'সত্যি কথা বলতে কি, সঠিক আমিও জানি না,' বলল ডাক্তার। 'অসুস্থ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অসুস্থতা তো আর এক রকমের নয়। অ্যাপেনডিসাইটিস? পেরিটনাইটিস? বোধহয় না। ব্যথা হচ্ছিল, সেটা মানসিক ব্যাধিরও উপসর্গ হতে পারে। এমন একটা পেশায় রয়েছে, সারাক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়। প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণে সাইকোসোমাটিক ডিজঅর্ডার দেখা দিয়েছে, তাও হতে পারে। মুশকিল হলো, আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই। তবে হাসপাতালে ওকে পাঠাতেই হবে। দেরি করাও চলবে না।'

'দেরি তো একটু হবেই,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আপনার অ্যাম্বুলেন্স সার্চ করার কথা ভাবছি আমি।'

হতভম্ব দেখাল ডাক্তারকে। 'কিন্তু কেন? কি আছে আমার অ্যাম্বুলেন্সে? নারকোটিকস আছে, প্রচুর পরিমাণেই আছে, থাকবেও। নাকি ভেবেছেন, প্রেসিডেন্টকে লুকিয়ে রেখেছি, নিয়ে পালাব? আচ্ছা, আপনিই বলুন, সাথে করে আনিনি অথচ নিয়ে যাচ্ছি এমন কি জিনিস আছে আপনার ব্রিজে? আমি একজন ডাক্তার, মি. চৌধুরী, এফ.বি.আই. এজেন্ট নই।'

'ঠিক আছে, সার্চের কথা ভুলে যান। কিন্তু আমি চাই আপনাদের সাথে একজন গার্ড যাবে। চোখে চোখে রাখার জন্যে।'

'একজন কেন, ছয়জন পাঠান। তবে চোখে চোখে যে কতক্ষণ রাখবে সে আমার জানা আছে।'

'তার মানে?'

'তার মানে, প্রফেসর কারচিভাল, আমাদের চীফ অভ সার্জারী, তাঁর ইউনিটটাকে সদ্যজাত শিশুর মত যত্ন করেন। প্রেসিডেন্ট বা আপনার মত লোককেও তিনি পরোয়া করেন না। আপনার লোক যদি ইমার্জেন্সী রিসেপশনে ঢুকতে চায়, পিস্তল হাতে তাড়া করবেন তিনি। এই রকম একবার তাড়া করতে দেখেছি আমি তাঁকে।'

'গার্ড পাঠাবার আসলে কোন দরকারও দেখছি না...'

'কিন্তু একটা জিনিস এখুনি দরকার,' বলল ডাক্তার। 'কাউকে দিয়ে হাসপাতালে একটা ফোন করান। ওদেরকে বলতে হবে, ইমার্জেন্সী অপারেটিং থিয়েটার যেন রেডি করে রাখে। ড. ম্যাকলিনও যেন হাজির থাকেন।'

'ড. ম্যাকলিন?'

'সিনিয়র সাইকিয়াট্রিস্ট।'

'আপনি জানেন,' ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে, 'প্রেসিডেন্ট কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবেন তা ঠিক করার সময় খেয়াল রাখা হয়, রাস্তার ধারে কাছে যেন একটা হাসপাতাল থাকে? বিপদের কথা তো বলা যায় না। আমাদের জন্যে সুবিধেই হলো, কি বলেন?'

'খুবই,' ডাক্তার ড্রাইভারের দিকে ফিরল। 'ওহে, সাইরেন বাজাও।'

downloadpdfbook.com

নয়

অ্যাম্বুলেন্স গেল দক্ষিণ দিকে, সেদিক থেকে এল টিভি ভ্যান আর জেনারেটার ট্রাক। আগে যেখানে আসন নিয়েছিল সেদিকে দল বেঁধে এগোল ফটোগ্রাফার, রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যানরা। সবাই ধরে নিয়েছে, কবীর চৌধুরী আগের মতই আরেকটা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতে যাচ্ছে। কয়েকজন ক্যামেরাম্যান এতই মেতে উঠল, জেনারেটার বয়ে নিয়ে এল যে ট্রাকটা, সেটারও ছবি তুলতে শুরু করে দিল তারা।

রানা চলল উল্টোদিকে। প্রেস কোচে উঠে নিজের সীটে বসল ও। ক্যামেরার নিচের অংশ খুলে মিনি ট্র্যানসিভারটা বের করল। নেড়েচেড়ে একবার দেখে ভরে রাখল পকেটে। ক্যারিয়ার ব্যাগ খুলল, ক্যামেরার তলায় স্পেয়ার ফিল্ম ভরল। ক্যামেরার নিচের অংশ ক্লিপ দিয়ে জোড়া লাগাচ্ছে, এই সময় মনে হলো কেউ লক্ষ্য করছে ওকে। ব্যস্ত হলো না, ধীরে ধীরে মুখ তুলল ও।

কুমড়ো আকৃতির মাথা। মায়াভরা দুটো চোখ। সেই চোখে নির্বোধ দৃষ্টি। হাসিটাও বোকা বোকা।

'প্রদ্যুৎ মিত্র, তাই না?'

'হ্যাঁ। রস পেরট, ঠিক না?'

'হ্যাঁ। সবাই বাইরে, আপনি একা ভেতরে কেন? এই ঐতিহাসিক ঘটনা ধরে রাখার কোন আগ্রহ নেই কেন আপনার মধ্যে?'

'অনেক কারণ আছে। শোনার ধৈর্য হবে না তোমার।'

'আমার কোন কাজ নেই,' বলল পেরট। 'সবগুলো কারণ শুনতে পারি।'

'এক, এখনও অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। দুই, টিভি ক্যামেরার জোরাল চোখ রেকর্ড করার কাজটা আমার এই ক্যামেরার চেয়ে হাজার গুণ ভাল করবে। তিন, ক্যামেরায় ফিল্ম আমি ছায়ায় বসে লোড করতে পছন্দ করি। আর দরকার আছে?'

'আপনার ক্যামেরা দেখতে অমন অদ্ভুত কেন?'

'অদ্ভুত বলেই অদ্ভুত,' বলল রানা। 'এটা হাতে তৈরি। সুইডিস। দুর্লভ জিনিস। এটাই দুনিয়ার একমাত্র ক্যামেরা যেটা দিয়ে একাধারে রঙিন স্টীল ছবি তোলা যায়, সাদা-কালো স্টীল তোলা যায়, সেই সাথে সিনে ক্যামেরা হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি।'

'একবার দেখতে পারি? ভাল ক্যামেরার ওপর আমারও ঝোঁক আছে।'

'দেখো, দেখো না!' হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল রানা। চিটচিটে ঘাম অনুভব করল। অথচ এয়ারকন্ডিশন অচল হয়ে পড়েনি।

গভীর মনোযোগের সাথে ক্যামেরাটা পরীক্ষা করছে পেরট। নিচের দিকে স্প্রিং ক্লিপ রয়েছে। যেন নিজের অজান্তেই সেটায় তার হাত পড়ল। রানার পাশের সীটে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল কয়েকটা ক্যাসেট আর স্পুল।

'দুঃখিত, ভারি দুঃখিত। এখন মনে হচ্ছে, ক্যামেরা নাড়াচাড়ায় এখনও হাত

পাকেনি আমার।' ক্যামেরাটা উল্টো করে ধরল পেরট। চোখে প্রশংসা নিয়ে তাকাল ফাঁকা ঘরের ভেতর। 'বাহ্, চমৎকার! চোরা কুঠরি, তাই না?'

বসে রয়েছে রানা, একটু উঁচু হয়ে রয়েছে সাইড পকেট। সেদিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না ও।

ক্যাসেট আর স্পুলগুলো ক্যামেরার পিছনের অংশে ভরে রাখল পেরট। ফ্ল্যাপ বন্ধ করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ক্যামেরা। 'আপনি আবার কিছু মনে করলেন না তো?'

'না। কি আর মনে করব।'

মুখে নির্বোধ হাসি নিয়ে কোচ থেকে নেমে গেল পেরট।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রানা। ভাবল, ক্যামেরার পিছনে যে দুটো খুদে স্প্রিং ক্লিপ আছে পেরট কি ওগুলো দেখেছে? বোধহয় দেখেছে। কিন্তু ওগুলো কেন, তা কি বুঝেছে সে? না বোধহয়। একটা ক্যামেরায় এটা সেটা অনেক কিছুই আটকাবার দরকার হয়, ক্লিপগুলো সে-ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয় বলে মনে করাই স্বাভাবিক।

সীটে একটু ঘুরে বসল রানা। নিজেদের কোচ থেকে জিম্মিরা নামছেন। সম্পূর্ণ শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন দেখাল প্রেসিডেন্টকে। পেরটকেও দেখতে পেল ও। জিম্মিদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে।

কোচ থেকে নামল রানা ড্রাইভারের উল্টোদিকের দরজা দিয়ে। এদিকে একজনও দর্শক বা প্রহরী নেই। ব্রিজের কিনারায় দাঁড়িয়ে রেলিঙের ওপর হাত রাখল ও। হাত থেকে ছেড়ে দিল ট্র্যানসিভার রেডিওটা। নিঃশব্দে কোচে ফিরে এল ও। দরজা বন্ধ করল। তারপর উল্টোদিকের দরজা দিয়ে আবার নেমে এল ব্রিজে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেরট, একটা চোখ টিপে হাসল। তারপর আবার মনোযোগ দিল জিম্মিদের দিকে।

কবীর চৌধুরী আগের মতই আয়োজন করেছে। এবারের আয়োজনেও কোন খুঁত নেই। জিম্মিরা তাঁদের নির্ধারিত জায়গায় বসেছেন। তাঁদের পিছনে বসেছে রিপোর্টাররা। ক্যামেরাম্যানরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একটা বড় পার্থক্য হলো, কবীর চৌধুরী এবার দুটো টিভি ক্যামেরা ব্যবহার করছে। তার নির্দেশে টিভি ক্যামেরা প্রথমে জিম্মিদেরকে সামনে রাখল। দর্শকরা তাদেরকে দেখছে বটে, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে শুনতে পাচ্ছে কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বর। প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে জিম্মিদের সবাইকে দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সে। ব্যাপারটা শুধু পুনরাবৃত্তি নয়, হাস্যকর পুনরাবৃত্তি। এ যেন মাকে মামার বাড়ির গল্প শোনানো। সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেবার পর দর্শকদের সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরল সে। বলল, 'বেশি কথার মানুষ নই আমি। আমার পরিচয়, আমি কবীর চৌধুরী, বাঙালী এক বিজ্ঞান-সাধক। জীবনে আমার একটাই কাজ, বিজ্ঞানের খেদমত করা। কিন্তু গবেষণা করতে হলে প্রচুর টাকা লাগে, অথচ চাইলে কেউ দেয় না। তাই আমি কেড়ে নিই। এর জন্যে জনতার আদালতে আমাকে যদি অপরাধী বলে রায় দেয়া হয়, সে রায় আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু একটা কথা আছে। রায় যদি মৃত্যুদণ্ড হয়, সেটা মেনে নিতেও আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু রায়টা কার্যকরী

করার আগে আমাকে বছর কয়েক সময় দিতে হবে। এই ক'বছর গবেষণা চালাব আমি। তারপর আবার একদিন এই কবীর চৌধুরী আপনাদের দরবারে এসে হাজির হবে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুদণ্ড বরণ করার জন্যে।'

এমন কি জিম্মিরা পর্যন্ত বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেন। কারও বুঝতে অসুবিধে হলো না ছোট্ট ভাষণটা দিয়ে বেশিরভাগ মার্কিন জনগণের সহানুভূতি আদায় করে নিয়েছে কবীর চৌধুরী।

'এবার কাজের কথা,' আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'আমাদের আজকের বিকেলের অনুষ্ঠানে আমরা দুটো টিভি ক্যামেরা ব্যবহার করছি। একটার সাহায্যে আপনারা আমাদেরকে দেখছেন, আমরা যারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি। অপর ক্যামেরাটা মুখ করে রয়েছে দক্ষিণ, অর্থাৎ সান ফ্রান্সিসকোর তীরের দিকে। এটা একটা টেলিফোটোজুম লেন্সসহ ট্র্যাকিং ক্যামেরা। আধ মাইল দূরের জিনিস দেখবেন কিন্তু মনে হবে দশ ফিট দূর থেকে দেখছেন। আজ বিকেলে কুয়াশা নেই, কাজেই এই ক্যামেরা ভালই কাজ দেখাতে পারবে। এবার ওটার কাজ দেখুন।'

চৌকো বাক্সের ওপর থেকে ক্যানভাসের আবরণ সরিয়ে ফেলল কবীর চৌধুরী। তারপর হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে এগিয়ে এল প্রেসিডেন্টের দিকে। প্রেসিডেন্টের পাশেই বিশেষ ভাবে খালি রাখা হয়েছে একটা চেয়ার, এগিয়ে এসে সেটায় বসল কবীর চৌধুরী। আবরণমুক্ত জিনিসটার দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

'আমাদের সম্মানীয় মেহমানদের জন্যে যোগাড় করা হয়েছে এটা,' বলল সে। 'দেখতেই পাচ্ছেন, একটা কালার টিভি। মেড ইন আমেরিকা, অফকোর্স।'

খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন প্রেসিডেন্ট। তিনি জানেন, সভ্য জগতের বেশিরভাগ লোকের দৃষ্টি এখন তাঁর ওপর। বেশ জোর গলায় বললেন তিনি, সবাই যাতে শুনতে পায়, 'এই টিভি আপনি নিশ্চয়ই টাকা দিয়ে কিনে আনেননি, মি. চৌধুরী!' সম্বোধন, ভাষা ইত্যাদি ব্যাপারে আগের চেয়ে অনেক সাবধান তিনি।

'এধরনের ছোটখাট ব্যাপারে যে লোক মাথা ঘামায় সে একটা দেশের প্রেসিডেন্ট হয় কিভাবে, আমি বুঝতে অক্ষম!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল কবীর চৌধুরী। 'টিভিটা আপনাদের জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে কোটি কোটি দর্শকদের সাথে আপনারাও দেখতে পান প্রথম বিস্ফোরক কোথায় কিভাবে ফিট করা হবে। দক্ষিণ টাওয়ারের কাছে একটা সাসপেনশন কেব্‌ল্‌-এ ফিট করা হবে ওই চার্জ। এখান থেকে দূরত্ব, দু'হাজার ফিট। উঁচু পাঁচশো ফিটেরও বেশি। এই টিভি না আনা হলে অনুষ্ঠানটা চাক্ষুষ করার সুযোগ থেকে আপনারা বঞ্চিত হতেন।' আপনমনে হাসল কবীর চৌধুরী। 'এবার, প্লীজ, রিয়্যার কোচ থেকে যে ভেহিকেলটা নেমে আসছে, ওটার দিকে মনোযোগ দিন।'

সবাই তাকাল। ওরা খালি চোখে যা দেখছে, টিভিতেও তাই দেখা যাচ্ছে। গাড়িটা অনেকটা ছাল ছাড়ানো, গলফ-কার্টের খুদে সংস্করণের মত। কাঠের ঢালু গা বেয়ে নেমে এল নিঃশব্দে, বোঝা গেল ইলেকট্রিসিটিতে চলে। গাড়িটা চালিয়ে আনল হুয়ান, পিছন দিকের ছোট একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, তার ঠিক

পাশে এবং নিচে ব্যাটারি কেস। তার সামনেও রয়েছে ইস্পাতের সমতল একটা প্ল্যাটফর্ম। ওখানে দেখা গেল অস্বাভাবিক মোটা রশি, পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে। আরও দেখা গেল ছোট একটা উইঞ্চ।

রিয়্যার কোচ থেকে নেমেই গাড়িটা দাঁড় করাল হুয়ান। কোচ থেকে এরপর নেমে এল চারজন লোক। দু'জন বয়ে আনল অত্যন্ত ভারী একটা ক্যানভাস স্ট্র্যাপ, ভেতরে এক্সপ্লোসিভ। গাড়ির প্ল্যাটফর্মে, রশির পাশে রাখা হলো সেটা। বাকি দু'জন আরও দুটো জিনিস বয়ে নিয়ে এল। দুটোই আট ফিট লম্বা। প্রথমটা একটা বুটহুক। অপরটা এইচ-সেকশনড স্টীল বীম, এক প্রান্তে রয়েছে বাটারফ্লাই স্ক্রু ক্ল্যাম্প, আরেক ধারে পুলি।

'এক্সপ্লোসিভের যে স্ট্র্যাপ দেখতে পাচ্ছেন, ওটা দশ ফিট লম্বা,' মুখ খুলল কবীর চৌধুরী। 'সাথে রয়েছে ত্রিশটা মোচা আকৃতির হাই এক্সপ্লোসিভ। প্রতিটির ওজন পাঁচ পাউন্ড। আর রশির যে স্তূপ দেখতে পাচ্ছেন, লম্বা করলে ওটা সিকি মাইল পর্যন্ত যাবে। সাধারণ কোন রশি নয়, আটশো পাউন্ড ভার ধরে রাখতে পারবে।' ইঙ্গিত দিল সে, সাথে সাথে অদ্ভুতদর্শন গাড়ি ছেড়ে দিল হুয়ান।

টিভি লেন্সের দিকে সরাসরি তাকাল কবীর চৌধুরী। 'আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে ব্রিজের টাওয়ারগুলোর কাঠামো আসলে সলিড বা নিরেট নয়।' তার সামনের এবং দুনিয়ার কোটি কোটি টিভি পর্দায় দক্ষিণ টাওয়ার স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'স্টীল ফ্রেমওয়র্ক বক্স, ওগুলোকে বলা হয় সেল। এই সেল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে টাওয়ারগুলো। সেলগুলো ফোন বুদ আকারের, তবে দ্বিগুণ লম্বা। চিরে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগানো হয়েছে ওগুলোকে, যোগাযোগের জন্যে রাখা হয়েছে ম্যানহোল। প্রতিটা টাওয়ারে এধরনের পাঁচ হাজারের বেশি সেল আছে। সিঁড়ি পাবেন, পাবেন এলিভেটর। এই দুটোর নাগালের মধ্যে রয়েছে মোট তেইশ মাইল।'

সীটের তলা থেকে একটা ম্যানুয়াল বের করল সে।

'যে-কোন অজ্ঞ লোকের পক্ষে এই পাতালপুরীতে হারিয়ে যাওয়া পানির মত সহজ। একবার, এই ব্রিজ যখন তৈরি হচ্ছিল, দু'জন লোক উত্তর টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে সারাটা রাত ধরে চেষ্টা করে। ব্রিজের ডিজাইনার এবং বিল্ডার, যোসেফ স্ট্র্যাস, এই টাওয়ারের ভেতর সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতে পারতেন, কেউ তাঁকে খুঁজে বের করতে পারত না। তিনি নিজেই ছাব্বিশ পাতার একটা ম্যানুয়াল রচনা করেন, যাতে টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসার পথ-নির্দেশ দেয়া ছিল। আমার হাতের এটা সেই ম্যানুয়ালেরই আধুনিক সংস্করণ।

'এই মুহূর্তে আমার দু'জন লোক টাওয়ারে উঠছে। বে-র দিকে মুখ করে রয়েছে যেটা, ওটায়। ওদের দু'জনের কাছেই একটা করে ম্যানুয়াল আছে, অবশ্য ব্যবহার করার দরকার হবে না—এলিভেটরে করে উঠছে ওরা। পনেরো পাউন্ডের একটা বোঝা ছাড়া ওদের সাথে আর কিছু নেই। ওই বোঝা কি কাজে লাগবে, একটু পরই আপনারা জানতে পারবেন। আসুন, এবার আমাদের ইলেকট্রিক ট্রাকের দিকে একটু খেয়াল দেয়া যাক।'

টেলিফোটো টিভি ক্যামেরা টাওয়ার থেকে হুয়ানের ওপর নেমে এল। দক্ষিণ

টাওয়ারের বিশাল চারটে আড়াআড়ি অবলম্বনের মধ্যে সবচেয়ে যেটা নিচু, সেটার প্রায় সরাসরি তলায় থামল ট্রাকটা।

'এলিভেশন, প্লীজ,' নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী।

টেলিফোটো ক্যামেরা বে-সাইড টাওয়ারের স্যাডল-এর ওপর স্থির হলো আবার। স্যাডল হলো বাঁকানো স্টীল হাউজিং, যার ওপর দিয়ে কেব্‌ল্ এগিয়ে গেছে। স্যাডলের পাশে দু'জন লোক হাজির হলো—ব্রিজের মাঝখান থেকে যারা দেখছে তাদের চোখে খুদে দুটো মূর্তির মত লাগল, কিন্তু টিভির পর্দায় ক্লোজ আপ ছবি।

'ওই টাওয়ারের মাথায় আমাকে যদি দাঁড়াতে বলেন, মাফ করবেন, আমি পারব না,' শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'একবার যদি পা ফসকে যায়, সাড়ে সাতশো ফিট নিচে গোল্ডেন গেটের ঠাণ্ডা-বরফ পানি। মাত্র সাত সেকেন্ডের একটা পতন, কিন্তু ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইল গতিতে পানিতে পড়া আর কংক্রিটের মেঝেতে পড়া, বোধহয় একই। তবে ওরা দু'জন ওখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ, ওদের আমি নাম দিয়েছি, স্পাইডারম্যান।'

ক্যামেরা আবার হুয়ানের ওপর নেমে এল। একটা পিস্তল বের করল সে। অস্বাভাবিক লম্বা তার ব্যারেল, অস্বাভাবিক চওড়া তার মাজল। ওপর দিকে তাক করে লক্ষ্য স্থির করল সে, তারপর ফায়ার করল। যে মিসাইলটা বেরিয়ে গেল, ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। ক্যামেরা শুধু দেখাল, ঠিক চার সেকেন্ড পর, স্যাডলের পাশে দাঁড়ানো নটহ্যামের হাতে একটা সবুজ কর্ড পৌঁছে গেছে। কর্ডটা তাড়াহুড়ো করে টেনে নিল সে। কর্ডের শেষ প্রান্তে একটা লেদার-হ্যাংড পুলি রয়েছে, পুলিটা সংযুক্ত হয়েছে রশির একটা প্রান্তের সাথে। রশিটা নটহ্যামের হাতে আসতে আড়াই মিনিট সময় নিল।

রশি ধরে থাকল নটহ্যাম, তার সঙ্গী টেলর কর্ড আর পুলি দুটোই খুলে নিল। রশিটা আরও বারো ফিট টেনে নিল নটহ্যাম, এই অংশটা ছুরি দিয়ে কেটে ধরিয়ে দিল টেলরের হাতে। টেলর সেটার এক প্রান্ত বাঁধল একটা অবলম্বনের সাথে আরেক প্রান্ত বাঁধল পুলির স্ট্র্যাপের সাথে। পুলির মাথায় একটা ফুটো আছে, রশিটা এবার সেই ফুটো দিয়ে গলিয়ে নিয়ে আসা হলো সীসার একটা ভারী টুকরোর কাছে। সীসাটা নাশপাতি আকৃতির, সাথে করে নিয়ে এসেছে ওরা। এরপর নাশপাতি আর রশি, দুটোকেই ছেড়ে দেয়া হলো। ব্রিজ লেভেলে নেমে এল ওগুলো।

হুয়ান, টেলর আর নটহ্যামকে আরও প্রায় দশ মিনিট দেখানো হলো টিভিতে। নানা কৌশল আর বুদ্ধি খাটিয়ে এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে ওরা, যার সাহায্যে বিস্ফোরকগুলো নিরাপদে টাওয়ারে তোলা সম্ভব হলো।

'আমাদের প্ল্যান একটু বদলেছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'প্রথমে আমরা ঠিক করেছিলাম, উত্তর এবং দক্ষিণ, দুটো টাওয়ারকেই আমরা ফেলে দেব। তা নয়, এখন আমরা মাত্র একটা টাওয়ারের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি। চারটে এক্সপ্লোসিভ স্ট্র্যাপই দক্ষিণ টাওয়ারে থাকবে—প্রতিটি কেব্‌ল্-এ এক জোড়া করে । দক্ষিণ টাওয়ার যদি ভেঙে পড়ে, আমাদের ধারণা, ব্রিজের উত্তর অংশটাও তাকে অনুসরণ

করবে। উত্তর টাওয়ার ভাঙতে পারে, নাও পারে। না ভাঙলেও কিছু আসে যায় না, কারণ ব্রিজের বেশিরভাগই বিলীন হয়ে যাবে নদীগর্ভে।'

ঝট করে মেশিন-পিস্তল তুলল পেরট। উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মেয়র, আবার তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকিয়ে গেল।

টাওয়ারের মাথায় এখন শুধু নটহ্যামের কাঁধ দেখা যাচ্ছে। জেনারেল পীল জানতে চাইলেন, 'কি করছে ওরা?'

'স্ট্র্যাপে ডিটোনেটর লাগাচ্ছে,' সহাস্যে জবাব দিল কবীর চৌধুরী। 'আপনারা টাকা না দিলে জিম্মিদের নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ব আমরা এবং তারপরই বুম!'

প্রেসিডেন্ট মৃদু গলায় জানতে চাইলেন, 'তারমানে কি ট্রিগারিং ডিভাইস দুটো হেলিকপ্টারের একটায় আছে?'

'প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের আই.কিউ. টেস্ট করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। হেলিকপ্টারে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? ওই কাছেরটায়।' বিড়বিড় করে আরও কি যেন বলল কবীর চৌধুরী, হাঁদারাম বা ওই ধরনের একটা শব্দ, কিন্তু পরিষ্কার শুনতে পেল না কেউ।

দশ

ভাইস-প্রেসিডেন্ট ল্যাংফোর্ড চাবি ঘুরিয়ে টিভি সেট বন্ধ করে দিলেন। একাধারে চিন্তিত, বিমূঢ় ও উদ্বিগ্ন দেখাল তাঁকে। 'লোকটা ভিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিশ্রমী আর বুদ্ধিমান ভিলেন,' বললেন তিনি। 'আমি ভেবেছিলাম কোন পাগলের কাজ। কিন্তু যে লোক ছোট বড় সবকিছুই একটা নিখুঁত প্ল্যান ক'রে করে, তাকে আমি পাগল-ছাগল বলতে রাজি নই। আমার বিশ্বাস এই লোক একজন জাঁদরেল জেনারেল হতে পারত, হতে পারত আমার চেয়েও বড় একটা কিছু। অন্তত টিভিতে তাকে একটুখানি দেখে সেই ধারণাই হলো আমার। আপনারা কেউ আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন?'

বিশালদেহী পুরুষ ল্যাংফোর্ড। তাঁর ধারণা, জীবনের সব কিছুতেই কৌতুকের খোরাক আছে, শুধু আহরণ করতে জানতে হবে। ক্ষমতার প্রতি তাঁর লোভ নেই, আকর্ষণ আছে। দুর্বল স্বাস্থ্যের লোকজন তাঁর সাথে হাস্য-কৌতুকে যোগ দেয় না, কারণ ওই সময় অন্য লোকের পিঠে চাপড় মারা তাঁর একটা অভ্যেস। কথা শেষ করে একে একে তিনি এফ.বি.আই. চীফ জেনারেল ফিদার হোপ, জেনারেল গারল্যান্ড, অ্যাডমিরাল সোরেনসন এবং সবশেষে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে তাকালেন। তিনি একা দখল করে আছেন একটা টেবিল, বাকি তিনজন আরেকটা টেবিলে বসেছেন। পাশের টেবিলে রয়েছেন পুলিস চীফ আর দুই সেক্রেটারি। হেডকোয়ার্টারের এই কনফারেন্স রুমে ছোট্ট আরও একটা টেবিল রয়েছে, সেটাকে সামনে নিয়ে বসে রয়েছে রানার নতুন ডাক্তার বন্ধু। জুলি রয়েছে কোণের একটা চেয়ারে।

কেউ কোন কথা বলল না দেখে বোঝা গেল ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে সবাই তারা একমত। বৃদ্ধ এফ.বি.আই. চীফ জেনারেল ফিদার হোপের দিকে একবার তাকালেন তিনি। ভদ্রলোককে ম্রিয়মাণ এবং কাতর দেখাল। ল্যাংফোর্ড তাঁকে আর বিরক্ত করলেন না। ফিরলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে। উপস্থিতদের মধ্যে তাঁর ওপরই সবচেয়ে বেশি আস্থা রাখেন তিনি। 'জর্জ? কি করতে চাও?'

'আগে রানার মেসেজটার কোড ভাঙা হোক, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট।'

'কোড! কোড! ছোকরাকে আমার যেন ইঁচড়ে পাকা বলে মনে হচ্ছে,' ভাইস-প্রেসিডেন্টের বলার ভঙ্গিতে একটু যেন তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পেল। 'মেসেজটা কোড করে জটিলতা না বাড়ালে কি তার চলত না? পরিস্থিতি কি এমনিতেই যথেষ্ট জটিল নয়?'

'রানা খুব সিকিউরিটি-কনশাস। মিস জুলি কি বললেন, শুনলেন তো? কবীর চৌধুরী অ্যাম্বুলেন্স তল্লাশী চালাতে চেয়েছিল। মাইক্রোফিল্মটা তার হাতে পড়তে পারত। কিন্তু তবু সেটার পাঠোদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব হত না।' নীল রঙের স্যুট পরা এক যুবকের হাত থেকে কোড ভাঙা মেসেজের দুটো কপি নিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। কামরা থেকে তখুনি আবার বেরিয়ে গেল যুবক।

সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রানার মেসেজ পড়তে শুরু করলেন হ্যামিলটন। 'পড়ছি।—''আমার যা যা দরকার, সেগুলোর ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে আপনাদের, তাই তালিকাটাই আগে দিচ্ছি…'' '

খুক্ করে কাশলেন অ্যাডমিরাল সোরেনসন। 'নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখেনি। স্যার বা ওই ধরনের কোন সম্বোধনও নেই।'

'রানা তো আর আমার বা আপনার চাকরি করে না। তাছাড়া, এই মেসেজ কার হাতে গিয়ে পড়বে, ওর জানা ছিল না। ''নীল কিংবা সবুজ রঙের চারশো গজ সরু কর্ড লাগবে আমার। আর লাগবে রিটেন মেসেজের জন্যে নল আকৃতির ওয়াটারফ্রুট কনটেইনার, একটা হুড পরানো মোর্স-টর্চ। একটা অ্যারোসল আর দুটো কলম দরকার আমার, একটা সাদা, একটা লাল। সি.এ.পি. এয়ার পিস্তল একটা। এগুলোর জন্য এই মুহূর্তে অর্ডার দিন, প্লীজ। এগুলো ছাড়া কিছুই করতে পারব না আমি''।'

জেনারেল গারল্যান্ড মাথার পিছনটা চুলকালেন। 'কোড ভাঙার পরও এই অবস্থা? ওগুলোর অর্থ কি, জর্জ?'

'তোমাকে জানানো উচিত হবে কিনা পরে সিদ্ধান্ত নেব,' বলে জেনারেল ফিদার হোপের দিকে তাকালেন হ্যামিলটন। 'জেনারেল হোপ এসবের অর্থ জানেন। এখানে সিভিলিয়নরা রয়েছেন, কাজেই অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারি না আমরা।'

একটু হেসে, মৃদু গলায় ডাক্তার বলল, 'আমি একজন ডাক্তার, ডাক্তাররা তথ্য চেপে রাখতে অভ্যস্ত। তাছাড়া, আমি কি একজন সিক্রেট এজেন্টও নই? হতে পারি নবিশ, কিন্তু মি. প্রদ্যুৎ মিত্র ওরফে মি. রানা কি আমাকে বিশ্বাস করেননি?'

হ্যামিলটনের চেহারা দেখে বোঝা গেল ডাক্তারের যুক্তি তিনি মেনে নিলেন। তাকালেন জুলির দিকে, 'তুমি কিছু বলবে, ইয়ং লেডি?'

'আলু পিঁয়াজ কাটার ছুরি দেখান, গড়গড় করে সব বলে দেব আমি,' বলল জুলি। 'ছুরি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে না, দেখালেই আমি নেই। তাছাড়া, শুধু ধমক, হুমকি বা ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে কেউ কথা আদায় করতে পারবে না।'

অ্যাডমিরাল সোরেনসন জানতে চাইলেন, 'মেয়ে এবং ছুরি, এই দুটো জিনিসকে চৌধুরী কি চোখে দেখে, জর্জ?'

'ভয়ের কিছু নেই। ক্রিমিন্যাল বটে, কিন্তু আর সব ক্রিমিন্যালদের মত নারী নির্যাতনকারী নয় সে। তার এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে রানার ধারণা হয়েছে, চৌধুরীকে দেখে যতটা অমানুষ বা ভাবাবেগহীন বলে মনে হয়, আসলে হয়তো তা নয় সে—তারও মনের কোন এক কোণে নিশ্চয়ই নরম একটু জায়গা আছে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল জুলির, 'কিন্তু প্রদ্যুৎ, মানে রানা আমাকে বলল যে কবীর চৌধুরী...'

'ও তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।' হ্যামিলটন ভাইস-প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। 'আসলে নক-আউট নার্ভ গ্যাস চেয়েছে রানা। এই গ্যাসই ব্যবহার করেছে চৌধুরী। এর প্রভাব বেশিক্ষণ থাকে না, ইয়ং লেডির উপস্থিতিই সেটা প্রমাণ করে। কলমগুলো সাধারণ ফেল্ট পেনের মতই দেখতে, মিসাইল হিসেবে ছুঁড়ে দেয় সরু সুচ। কারও গায়ে বিঁধলে সাথে সাথে অজ্ঞান।'

'সাদা আর লাল, দু'রঙের কেন?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল সোরেনসন।

'লাল কলমের সুচ বিঁধলে অনেকক্ষণ জ্ঞান ফিরবে না।'

'জিজ্ঞেস করতে পারি অনেকক্ষণ আর চিরকালের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু এখানে?'

'ক্ষেত্রবিশেষে কোন পার্থক্যই নেই। এয়ার পিস্তল—হ্যাঁ, এটার কাজ চিরকালের জন্যে বিদায় জানানো।'

'সি.এ.পি. কথাটার মানে কি?'

'এর মানে হলো, বুলেটের মাথায় কিছু আছে।'

'কিছু আছে! কি আছে?'

পাইপে আগুন ধরালেন হ্যামিলটন। সবাই তাঁর দিকে ঝুঁকে আছেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'সায়ানাইড।'

কয়েক সেকেন্ডের দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভেঙে ভাইস-প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'তোমার এই মাসুদ রানা অ্যাটিলা দ্য হুনের বংশধর নয় তো?'

'মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মাসুদ রানাকে আমি একজন যোগ্য অপারেটর হিসেবে জানি...।'

'যে এই রকম একটা মারণাস্ত্র ভাণ্ডারের অর্ডার দিতে পারে, আমিও তাকে যোগ্য না বলে পারছি না। জর্জ, লোকটা মানুষ মেরেছে?'

'হাজার হাজার পুলিস অফিসার মানুষ মারে, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট,' বিরক্ত বোধ করছেন হ্যামিলটন, কিন্তু সেটা প্রকাশ করছেন না। 'এক্সকিউজ মি।' প্যাড টেনে নিয়ে তাতে খস খস করে লিখতে শুরু করলেন তিনি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গেলেন, দরজা খুলে এক লোকের হাতে ধরিয়ে দিলেন কাগজটা।

'এই জিনিসগুলো আনাও, এক ঘণ্টার মধ্যে।' ফিরে এসে মেসেজটা আবার তুলে নিলেন তিনি।

'রানা বলছে, "আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং বা অন্য যে কোন দিক থেকে বিচার করলে কবীর চৌধুরীকে একটা প্রতিভা বলে স্বীকার করতে হবে। যে-কোন একটা কাজকে যুদ্ধ বলে মনে করে সে, রণ-কৌশল ঠিক করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটার ওপর। তবে, নির্ভুল হওয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। মাত্রা ছাড়ানো আত্মবিশ্বাসই তার কাল, অন্তত অতীতে সেটা কয়েকবারই প্রমাণিত হয়েছে। তারপর রয়েছে তার অহমিকা। এই অহমিকার জন্যেই রিপোর্টারদের ব্রিজে থাকতে দিয়েছে সে। তার জায়গায় আমি হলে, সব ক'টার ঘাড় ধরে ব্রিজ থেকে সরিয়ে দিতাম। লোকজন তাকে ঘিরে আছে, অবাক চোখে দেখছে এব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করছে সে। অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার এবং মিস জুলিকে সার্চ করা উচিত ছিল তার, উচিত ছিল অ্যাম্বুলেন্সের প্রতিটি মেডিকেল ইকুইপমেন্ট গোল্ডেন গেটের পানিতে ফেলে দেয়া। আমি বলতে চাইছি, নিরাপত্তার ব্যাপারে অতটা সচেতন নয় সে।

' "তার এই দুর্বলতার সুযোগটাই নিতে হবে আমাকে। কিভাবে, এখনও জানি না। অনেক বুদ্ধিই আছে, কিন্তু কোনটাই প্র্যাকটিক্যাল নয়। ওদের মধ্যে সতেরোজন সশস্ত্র, কিন্তু সতেরোজনের মধ্যে আমি ধরি মাত্র দু'জনকে। বাকি পনেরোজন নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু বর্ণ লীডার শুধু চৌধুরী আর পেরট। এদের দু'জনকে মেরে ফেলা আমার জন্যে কোন সমস্যা নয়"।'

'মানুষ মারবে!' জুলির সবুজ চোখ জোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। 'মাসুদ রানা তুমি একটা মনস্টার!'

'হলেও,' এই প্রথম কথা বললেন এফ.বি.আই. চীফ জেনারেল ফিদার হোপ, 'সে একটা রিয়্যালিস্টিক মনস্টার।'

' "কিন্তু সম্ভব হলেও কাজটা বোকামি হয়ে যাবে। নেতারা খুন হলে শিষ্যরা উন্মাদ হয়ে উঠে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে—দেবে। ওই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট বা তাঁর মেহমানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি কোন গ্যারান্টি দিতে পারব না। দ্বিতীয় শেষ উপায় হিসেবে হাতে থাকল এটা।

' "একটা সাবমেরিন পাঠানো সম্ভব? রাতের বেলা ব্রিজের নিচে অপেক্ষা করবে, কোনিং টাওয়ারের শুধু ডগাটা দেখা যাবে। তাহলে আমি মেসেজও পাঠাতে পারব, কিছু দরকার হলে তা ডেলিভারিও নিতে পারব। আর কি ডেলিভারি নিতে চাইব, জানি না। রশির মই? কিন্তু মই বেয়ে দু'শো ফিট নেমে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট, এটা আমার কল্পনায় আসছে না। দশ ফিট নামার পরই মই ছেড়ে দিয়ে শূন্যে লাফ দেবেন তিনি।

' "কবীর চৌধুরীর লোকেরা এক্সপ্লোসিভ ফিট করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, শেষ করতে আরও অনেকক্ষণ লাগবে। কাজটা শেষ হবার আগে কি কেব্‌লগুলোয় দুই হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিক ধাক্কা দেয়া সম্ভব? জানি, তাতে করে গোটা ব্রিজ ইলেকট্রিফায়েড হয়ে যাবে, কিন্তু যারা রাস্তায় বা কোচের ভেতর থাকবে তাদের কোন বিপদ হবে না"।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'দু'হাজার ভোল্ট কেন?'

'ইলেকট্রিক চেয়ারে দু'হাজার ভোল্ট ব্যবহার করা হয়।'

'আর কোন সন্দেহ নেই, অ্যাটিলা দ্য হুনেরই বংশধর।'

'জ্বী। "কিন্তু এর একটা অসুবিধে আছে। কেউ যদি, ধরুন প্রেসিডেন্টই ব্রিজের রেলিঙে হাত দিলেন বা ক্র্যাশ ব্যারিয়ারে বসে পড়লেন? তাহলে নতুন প্রেসিডেনশিয়াল-ইলেকশন না দিয়ে উপায় থাকবে না। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দরকার আমার। কিংবা এক্সপ্লোসিভ ফিট করা হয়ে গেলে, লেজার বীম তাক করা সম্ভব? লেজার বীম ক্যানভাসের আবরণ পুড়িয়ে ফেলবে সন্দেহ নেই, চার্জগুলো যদি ব্রিজে পড়ে, নির্ঘাত নিজে থেকেই বিস্ফোরিত হবে, কিন্তু বিস্ফোরণের বেশিরভাগ ধাক্কাই লাগবে বাতাসে, রাস্তার ক্ষতি খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না। তবে ব্রিজটা যে ভেঙে নদীতে পড়বে না, জোর দিয়ে বলতে পারি। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় হলো, লেজার বীম নিজেই চার্জগুলোকে ডিটোনেট করে দিতে পারে। দয়া করে ভালমত ভেবে দেখুন।

' "প্রয়োজনীয় আড়াল তৈরি করে টাওয়ারে লোক তোলা সম্ভব? সবচেয়ে ভাল হয় অকৃত্রিম কুয়াশার সাহায্য পাওয়া গেলে। বাতাস অনুকূল দিকে থাকলে পানিতে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলে কি হয়? সাগরে এই রকম আগুন প্রায়ই তো লাগে। টাওয়ারে ওঠার পর লিফট নিচে পাঠিয়ে দিতে হবে, তারপর সব ক'টা এলিভেটর অকেজো করার জন্যে কেটে দিতে হবে পাওয়ার লাইন। তারপর কেউ যদি সিঁড়ি বেয়ে পাঁচশো ফিট ওঠে উঠুক, ওঠার পর তার আর কিছু করার মত শক্তি থাকবে না।

' "খাবারের সাথে ড্রাগ মেশানো সম্ভব? খুব দ্রুত কাজ করে সেরকম ড্রাগ হলে চলবে না। আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অজ্ঞান করে রাখতে পারলেও যথেষ্ট। তবে, খাবার মুখে দেয়ার সাথে সাথে কেউ যদি বেহুঁশ হয়ে পড়ে, ভেবে দেখুন কবীর চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া কি হবে। খাবারের ট্রে-তে মার্ক থাকা দরকার, যাতে সতেরোটা ট্রে সতেরোজন ভিলেনের কাছে যায়"।'

ডাক্তারের দিকে ফিরলেন হ্যামিলটন। 'এ-ধরনের ড্রাগ আছে?'

'আছে বৈকি,' জবাব দিল ডাক্তার। 'না থাকলে ওই ভদ্রলোক চাইতেন না।'

'তা ঠিক। "প্লীজ পরামর্শ দিন। এই মুহূর্তে করার কাজ একটাই দেখতে পাচ্ছি আমি। চার্জ বিস্ফোরিত করাবার জন্যে যে রেডিও ট্রিগারটা আছে, সেটাকে অকেজো করার চেষ্টা করতে পারি। ওটা কেউ নাড়াচাড়া করেছে, ওদেরকে বুঝতে দেয়া চলবে না। কাজটা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু ওটার কাছে পৌঁছানো সাংঘাতিক কঠিন। ট্রিগারটা আছে হেলিকপ্টারে। রাত দিন সব সময়ের জন্যে আলোর ব্যবস্থা আছে ওদিকে। গার্ড তো আছেই। তবু চেষ্টা করব। শেষ"।'

'দ্বিতীয় শেষ উপায়ের কথা বলা হলো, শেষ উপায়টা তাহলে কি?' জানতে চাইলেন জেনারেল গারল্যান্ড।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন হ্যামিলটন। 'তুমি যেখানে আমিও সেখানে। শেষ একটা উপায় যদি রানার হাতে থাকে, সেটা চেপে গেছে ও। মেসেজের একটা করে কপি সবাইকে দেয়া হবে,' বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'ফটোস্ট্যাট

করিয়ে আনি।' কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। নীল কোট পরা যুবককে ইশারায় কাছে ডেকে তার হাতে মেসেজটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'দশ কপি।' মেসেজের শেষ প্যারাগ্রাফে আঙুল রেখে নির্দেশ দিলেন, 'এই অংশটা কপি হবে না। অরিজিন্যালটা শুধু আমাকে ফেরত দেবে।' কামরায় ফিরে এলেন তিনি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে কপিগুলো হাতে পেলেন হ্যামিলটন। ছয়টা তিনি বিলি করলেন, অরিজিন্যালটার সাথে বাকি চারটে রাখলেন নিজের কাছে।

যে যার কপি চোখের সামনে তুলে পড়তে শুরু করলেন।

জেনারেল গারল্যান্ড অভিযোগের সুরে বললেন, 'আমি যে কিছু অবদান রাখব, এই ছোকরা তার কোন অবকাশই রাখেনি। বুঝতে পারছি, আজ আমার কৃতিত্ব দেখাবার দিন নয়।'

'আমার কথাটা তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে,' অ্যাডমিরাল সোরেনসন বললেন, 'জর্জ, তোমার এই মাসুদ রানা, সত্যি, কাজের ছেলে।'

'মাসুদ রানা আমার নয়।'

'তোমার সাথে পরিচয় আছে, সেটাও কম কথা নয়। এই রকম একটা ছেলের সাথে আমার পরিচয় থাকলে রাতে আরও একটু ভাল ঘুম হত, জীবন হত আরও একটু নিরাপদ।'

'কিন্তু যত ভালই হোক রানা, নড়াচড়ার জন্যে ওরও জায়গা দরকার। আমি বলতে চাইছি, সুযোগ সুবিধে থাকা দরকার। তা ওর নেই।'

সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী নিউসম তাঁর দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে বললেন, 'এসব ব্যাপারে আমার ভাল ধারণা নেই। তবে মনে হচ্ছে, সমাধানের চাবি রয়েছে হেলিকপ্টারগুলোয়। ওগুলো ধ্বংস করার কি কোন উপায় আছে?'

জেনারেল গারল্যান্ড বললেন, 'উপায় অনেকগুলোই আছে। প্লেন, কামান, রকেট, ওয়্যায়ার-গাইডেড অ্যান্টি ট্যাংক মিসাইল। কেন?'

'ওই হেলিকপ্টারে করেই কবীর চৌধুরী আর তার দলবল পালাবে। পালাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে ব্রিজে থাকতে বাধ্য হবে ওরা। আর ব্রিজে থাকলে সেটাকে উড়িয়ে দিতে পারবে না। তখন কি ঘটবে?'

জেনারেল গারল্যান্ড ট্রেজারী সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে থাকলেন, কিন্তু তাঁর চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটল না। বললেন, সম্ভাব্য তিনটে ব্যাপার ঘটতে পারে। এক, মি. প্রেসিডেন্টের কান কাটার হুমকি দিয়ে একটা ক্রেন চাইবে চৌধুরী। ক্রেনের সাহায্যে বিধ্বস্ত 'কপ্টার দুটো গোল্ডেন গেটে ফেলে দিয়ে আবার কান কাটার হুমকি দিয়ে নতুন এক জোড়া 'কপ্টার চাইবে। দুই, শেল, রকেট বা মিসাইল যাই ছোঁড়া হোক, নিরীহ লোক মারা পড়ার আশঙ্কা প্রচুর। তিন, ভেবে দেখেছেন 'কপ্টার বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে ট্রিগারিং ডিভাইসটাও বিস্ফোরিত হবে? তখন যদি ট্রিগারিঙের কাজটাও বাকি না থাকে? ব্রিজ নদীতে পড়ে গেলে কবীর চৌধুরী আর তার দলবল সবাই মারা পড়বে, ঠিক। কিন্তু সেটা জেনে আমাদের আনন্দ প্রকাশের সময় হবে না। কারণ, সেই সাথে মি. প্রেসিডেন্ট এবং মেহমানরাও পড়বেন পানিতে।'

'তারচেয়ে আমি বরং আমার টাকা গোণার কাজেই লেগে থাকি,' সেক্রেটারি

অভ ট্রেজারী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'আগেই তো বলেছি, এসব ব্যাপারে আমার ভাল ধারণা নেই।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'আমার পরামর্শ, আসুন সবাই পাঁচ মিনিট ধ্যান করি। দেখা যাক কেউ আমরা কোন দৈববাণী পাই কিনা।'

তিনি মৌখিক সায় পেলেন না, কিন্তু দেখা গেল সবাই চোখ বুজে রয়েছেন।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলেন হ্যামিলটন। তারপর জানতে চাইলেন, 'ফলাফল?'

কামরার ভেতর জমাট বেঁধে থাকল নিস্তব্ধতা।

'সেক্ষেত্রে,' হ্যামিলটন বললেন, 'আসুন, রানার কথা মতই কাজ করি আমরা।'

downloadpdfbook.com